১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

শাশ্বত সত্য

মার্চ-এপ্রিল-মে



সম্পাদকীয় | অভিমত



এসএসএস’ কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘শাশ্বত সত্য’ ইতিমধ্যে তার পথচলায় এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অতিক্রম করেছে। প্রথম বর্ষে তিনটি সংখ্যা এবং দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার পর, এখন আমরা দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় উপনীত—একটি যাত্রা, যা নিষ্ঠা ও সাধনার সাক্ষ্য বহন করে।

এই পথ সহজ ছিল না। নিন্দা, প্রতিবন্ধকতা ও সমর্থনের অভাব সত্ত্বেও আমরা আমাদের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হইনি। সত্যের প্রকাশ, তার নির্ভীক প্রচার এবং সনাতনীদের ঐক্য—এই আদর্শকে সামনে রেখেই আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অল্পসংখ্যক সচেতন পাঠকের আন্তরিক আগ্রহই আমাদের এই পথচলায় নতুন প্রেরণা জোগায়। যাঁরা এই যাত্রায় আমাদের পাশে থেকেছেন, তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আজকের সময়ে, যখন স্বার্থসিদ্ধিই প্রায়শ ধর্মচর্চার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন আমরা সেই প্রবাহের ঊর্ধ্বে থেকে নিঃস্বার্থ সাধনায় অটল থাকার চেষ্টা করছি। আমাদের এই প্রচেষ্টা কেবল একটি পত্রিকা নয়, বরং এক আদর্শের ধারক ও বাহক।

আপনাদের সকলের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ—নিজেরা পড়ুন এবং অন্যদের মধ্যেও এই পত্রিকা পৌঁছে দিন। আপনাদের প্রশ্ন ও সংশয় আমাদের জানালে, আমরা পরবর্তী সংখ্যায় সেগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণই আমাদের পথকে আরও সুদৃঢ় করবে।

সত্যমেব জয়তে...

মৃগাঙ্ক রায়

সম্পাদক, শাশ্বত সত্য

গবেষক, সনাতন শাস্ত্র গবেষণা কমিটি

সত্যের সন্ধানে সনাতন

সম্পাদকীয় | অভিমত



সম্পাদক, ম্যাগাজিন কমিটির সদস্য, এসএসএস-এর সকল সদস্য, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক সহযোগিতা ও আশীর্বাদে "শাশ্বত সত্য"-এর দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো। সত্যকে ধারণ ও প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হলেও, আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনই আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা। এই সংখ্যায় ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাসভিত্তিক প্রবন্ধের পাশাপাশি রয়েছে কবিতা, সৃজনশীল লেখা ও শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু—যাতে প্রতিটি পাঠক নিজের মতো কিছু খুঁজে পান। প্রয়াস কেবল একটি পত্রিকা নয়, সত্য ও চেতনার এক নিরন্তর যাত্রা। পাঠকের চিন্তাজগতে নতুন আলোর সঞ্চার ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই পথচলা আরও বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হোক—এই কামনা।

তিশা দাশ

প্রচারক, শাশ্বত সত্য

সত্যই শক্তি—স্বামীজির ভাষায়, শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। সত্যান্বেষীর অদম্য সাধনা ও সাহসের কাছে মিথ্যা চিরকাল পরাজিত। 'সত্যের সন্ধানে সনাতন'-এর ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'শাশ্বত সত্য' তারই ধারায় ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যা প্রকাশ করছে—এতে যুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। এই সাধনা অব্যাহত থাকুক; সত্যান্বেষীর কণ্ঠে সরস্বতীর বাণী, অন্তরে মহামায়ার শক্তি বিরাজ করুক।

এই উদ্যোগ সত্যপ্রেমী হৃদয়ে জাগ্রত করুক নতুন প্রেরণা ও চেতনা। আগামী দিনেও সত্যের দীপ জ্বালিয়ে এই পথচলা আরও সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় হোক।

দীপঙ্কর তালুকদার জয়

সংশোধক, শাশ্বত সত্য

ত্রৈমাসিক

সূচিপত্র

গ্রীষ্ম সংখ্যা

২য় বর্ষ • ২য় সংখ্যা

মার্চ-এপ্রিল-মে

২০২৬ ইং | ১৪৩২-৩৩ বং

সম্পাদক মণ্ডলী

সার্বিক পরিচালনায় ও প্রকাশনায়:
‘সত্যের সন্ধানে সনাতন’



শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের ব্যাখ্যা কি মনোকল্পিত?

শ্রী অপূর্ব মোদক চৌধুরী
গবেষক, সত্যের সন্ধানে সনাতন

বেদে বর্ণিত চারটি মহাবাক্যের একটি "তত্ত্বমসি"। শুক্লযজুর্বেদীয় পৈঙ্গল উপনিষদ ৩/১/২ এ উল্লেখিত চারটি মহাবাক্যের মধ্যে এর উল্লেখ রয়েছে এমনকি, সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদেও বর্ণিত হয়েছে। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থ কেবলাদ্বৈতবাদীগণ অর্থ করেন - "তৎ ত্বম অসি" বা জীবব্রহ্মৈক্য হিসেবে ধরে। যদিও তত্ত্বমসি মহাবাক্য, যে সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের অন্তর্গত শ্রুতির (৬/৯/৪), সেই শ্রুতির পূর্ববর্তী (৬/৯/১-২) এবং পরবর্তী (৬/১০/১) শ্রুতি বিচার করলে জীব ও সৎস্বরূপ ব্রহ্মের ঐক্যই নির্দেশিত হয়। তা সত্ত্বেও অনেকে মনে করেন যে তত্ত্বমসির যে অর্থ "তৎ ত্বম অসি" বা জীবব্রহ্মৈক্য প্রতিপাদ্য সেটা শঙ্করের নিজস্ব কথা, এর কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি নেই। কিন্তু বিষয়টি সঠিক নয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে তত্ত্বমসির অর্থ হিসেবে "তৎ ত্বম অসি" ও জীবব্রহ্মৈক্য প্রতিপাদ্য হিসেবে পাওয়া যায়। যেমন:

১) শান্তিগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন,

তদ্বাধস্য হি সীমানং ত্যাগযোগ্যং স্বয়ম্প্রভম্
ত্বমাত্মত্বেন সংবিদ্ধি চেতি "ত্বং" পদ শোধনম্।
তৎশব্দস্য এ পারোক্ষ্যং মায়োপাধিং পরিত্যজ।
তদধিষ্ঠানচৈতন্যং পূর্ণমেকং সদব্যয়ম।।
তয়োরৈক্যং মহাবাহো নিত্যাখন্ডাবধারণম্।
ঘটাকাশো মহাকাশ ইবাত্মানং পরমাত্মনি।
ঐক্যমখন্ডভাবং ত্বং জ্ঞাতা তূষ্ণীং ভবার্জ্জুন।।

(শান্তি গীতা ৩/৩২-৩৩)

২) ব্রহ্মান্ডপুরাণের (মতান্তরে অধ্যাত্মরামায়ণে) শ্রীরাম বলেছেন,

শ্রদ্ধান্বিত স্তত্ত্বমসীতি বাক্যতো গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধ মানসঃ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্য মথাত্মজীবয়োঃ সুখী ভবেন্মেরুরিবা প্রকম্পনঃ।।
আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং বাক্যার্থ বিজ্ঞান বিধৌ বিধানতঃ।
তত্ত্বং পদার্থো পরমাত্মজীবকাবসীতি চৈকাত্ম্য মথানয়োর্ভবেৎ।।

(রামগীতা ২৪-২৫)

৩) দেবীভাগবতোক্ত দেবীগীতাতেও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,

বেদান্তশ্রবণং কুর্যান্নিত্যমেবমতন্দ্রিতঃ।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য নিত্যমর্থং বিচারয়েৎ।।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং তু জীবব্রহ্মৈক্যবোধকম্।
ঐক্যে জ্ঞাতে নির্ভয়স্তু মদ্রূপো হি প্রজায়তে।।
পদার্থাবগতিঃ পূর্বং বাক্যার্থাবগতিস্ততঃ।
তৎপদস্য চ বাচ্যার্থো গিরেঽহং পরিকীর্তিতঃ।।
ত্বম্পদস্য চ বাচ্যার্থো জীব এব ন সংশয়ঃ।
উভয়োরৈক্যমসিনা পদেন প্রোচ্যতে বুধৈঃ।।
বাচ্যার্থয়োর্বিরুদ্ধত্বাদৈক্যং নৈব ঘটেত হ।
লক্ষণাঽতঃ প্রকর্তব্যা তত্ত্বমোঃ শ্রুতিসংস্থয়োঃ।।

(দেবীগীতা ৪/১৮-২২)

শুধু তাই নয় মুক্তিকা উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত ১০৮ উপনিষদের কিছু উপনিষদেও তত্ত্বমসির জীবব্রহ্মৈক্য প্রতিপাদনরূপ ব্যাখা ও তত্ত্বমসি মহাবাক্যকে 'তৎ ত্বম অসি' হিসেবে বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন:
শুক্লযজুর্বেদীয় পৈঙ্গল উপনিষদ মতেও তত্ত্বমসি জীবব্রহ্মৈক্য প্রতিপাদন করে।

Text like Tattvamasi declare the identity with Brahman of the real jiva concealed by ignorance and part of the unmanifest; not of the other two, The Empirical and the illusory jivas (in the walking and dream state). (2/9)

The expressed sense of the word 'tat' is the world-cause, marked by 'other-ness' (mediacy), having Being, Consciousness and Bliss as his characteristics, Maya as his adjunct and omniscience, etc., as his features. The very same with awareness mixed up with the inner sense, the object of the I-notion, is the expressed meaning of 'tvam'. Rejecting the adjuncts of the supreme (God) and the Jiva, viz.: Maya and avidya, the indicated sense of tat and tvam is Brahman, non-different from the inner Self. (3/3)

অথর্ববেদীয় নৃসিংহ উত্তরতাপনী উপনিষদেও (৯/১১) উল্লেখ আছে -

"স হোবাচ তথা এতদ্ব্রহ্মাদ্বয়ং বৃহত্ত্বান্নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তং সত্যং সূক্ষ্মং পরিপূর্ণমদ্বয়ং সদানন্দচিন্মাত্রমাঙ্গ্মৈবাব্যব্যবহার্য্যং কেনচেন তদেতদাত্মানমোমিত্যপশ্যংস্তঃ পশ্যত তদেতৎ সত্যমাত্মা ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাত্মৈব।।"

অনুবাদ: প্রজাপতি উক্ত প্রকারে দেবতাদিগকে ত্বং পদার্থ প্রত্যগাত্মা প্রকৃত কি, তাহা শোধিত করাইয়া তাহাদিগকে তৎ পদার্থ শোধনে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বলিতেছেন - কারণরূপে পরোক্ষকার্য্যে প্রবিষ্ট বলিয়া অপরোক্ষ সেই এই ব্রহ্ম, ইহাও বৃহত্বপ্রযুক্ত অদ্বয়। অদ্বয়ত্ব এই ব্রহ্মের বিশিষ্ট ধর্ম। বৃহ ধাতুর মুখ্যার্থ বৃদ্ধি উৎকর্ষ ধরিয়াই ঐ অদ্বয়ত্ব স্থির করা যায় এবং প্রত্যাগাত্মার মতো ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য সূক্ষ্ম পরিপূর্ণ ও চিন্মাত্র।
পরন্তু ইহাকে কোনো রূপেও ব্যবহার করা যায় না। এইরূপে ত্বং ও ত্বৎ এই পদার্থদ্বয় প্রকৃত অর্থে প্রযুক্ত করিয়া প্রণব দ্বারা অবিষয়ভাবে তাহাদিগের ঐক্য প্রতিপাদন করিবে। দেবগন! তোমরা উক্তরূপ ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া জান, এইক্ষণ "ওম্" এইরূপে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান কর। আর ব্রহ্মই যে আত্মা এবং আত্মাই যে ব্রহ্ম , ইহা ধ্রুব সত্য জানিও।
অর্থাৎ, এই বিষয়টা শাস্ত্রীয় ভাবে সিদ্ধ যে তত্ত্বমসি মহাবাক্য মূলত জীবব্রহ্মৈক্য বোধরূপ "তৎ ত্বম অসি"।

কিন্তু, তত্ত্বমসি এর ব্যাখা তো শাস্ত্রোক্তই ছিল সেখানে অদ্বৈতবেদান্তীগণ কেন লক্ষণার ব্যবহার করলেন? এর উত্তর সর্বজ্ঞাত্মমুনি তাঁর সংক্ষেপ শারীরকে বলেছেন -

"যখন একধর্মিবৃত্তি অবিরুদ্ধ দন্ড ও কুণ্ডলরূপ বিশেষণদ্বয়যুক্ত, দন্ডী ও কুণ্ডলীরূপ বিশিষ্টদ্বয়ের একতা (লক্ষণা বিনা) জ্ঞাত হইতে পারে না; (অর্থাৎ দন্ডী কণ্ডুলী পদ হইতে লক্ষণা ব্যতিরেকে বুঝা যায় না, এবং কুণ্ডলী দন্ডী পদ হইতে লক্ষণা ব্যতিরেকে বুঝা যায় না। কারণ, দন্ডে কুমণ্ডলসম্বন্ধ নাই, পুনঃ কুণ্ডলেও দণ্ড সম্বন্ধ নাই) তখন বিরুদ্ধ বিশেষণদ্বয় সর্বজ্ঞত্ব - অল্পজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ঈশ্বর (ব্রহ্ম) ও জীবের একতা (লক্ষণা বিনা) কখনই হইতে পারে না। (১/১৬৭)

অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতিতে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের তৎ ও ত্বম পদ কিভাবে অখন্ড ব্রহ্মকে ইঙ্গিত করে এর যৌক্তিক জবাব একমাত্র লক্ষণা দ্বারাই সম্ভব। নতুবা তত্ত্বমসি মহাবাক্যকে যে শাস্ত্রে "তৎ ত্বম অসি" হিসেবে দর্শানো হচ্ছে তা অপ্রামাণ্য হয়ে যাবে এবং পরিশেষে পৈঙ্গল উপনিষদের মতো প্রামাণ্য শ্রুতির উপর প্রশ্ন তৈরি হবে। অর্থাৎ, শ্রুতি নিন্দার অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের তৎ ও ত্বম পদের অন্বয় এবং তৎ ও ত্বং পদের অর্থ বেদান্ত অনুযায়ী জীবব্রহ্মৈক্য প্রতিপাদনরূপ করার স্বযৌক্তিক পথ একমাত্র লক্ষণার দ্বারা তত্ত্বমসির ব্যাখা করা। যেটা শঙ্করাচার্য্য, সর্বজ্ঞাত্মমুনি, বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর ও সদানন্দ যোগেন্দ্র সরস্বতী আদি অদ্বৈত আচার্যগণ করেছেন। যদিও এইরূপ লক্ষণার দ্বারা তত্ত্বমসির ব্যাখা ব্রহ্মান্ড পুরাণোক্ত অধ্যাত্ম রামায়ণের অন্তর্গত রামগীতাতেও রয়েছে (দ্রষ্টব্য ২৬ ও ২৭ নং শ্লোক)। তাই লক্ষণার দ্বারা তত্ত্বমসির ব্যাখা একদম অশাস্ত্রীয় বলাও অসঙ্গত। আদি গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁর বিবেকচূড়ামণি ২৮৩ নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন-

"শ্রুত্যা যুক্ত্যা স্বানুভূত্যা জ্ঞাত্বা সার্বাত্ম্যমাত্মনঃ।
ক্বচিদাভাসতঃ প্রাপ্তং স্বাধ্যাসোপনয়ং কুরু।।"

অনুবাদ: শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব এই তিনটির দ্বারা স্বীয় সর্ব্বাত্মত্ব স্থির করে কোন রূপে চিদাকাশ হইতে লব্ধ জীবত্বরূপ ভ্রম অপনয়ন কর।

অর্থাৎ, আদিগুরু সর্বদা অদ্বৈতবেদান্তের অধিকাংশ তত্ত্ব তা হোক ব্রহ্মাস্তিত্ববোধ বা হোক জীবব্রহ্মৈক্য বোধ বা হোক জগতের মিথ্যাত্ব সকল দার্শনিক মতকে শ্রুতি (Vedatism) যুক্তি (Rationalism) এবং অনুভূতি (Empiricism) এর সমন্বয়ে করেছেন। যার জলজ্যান্ত প্রমাণ তাঁর ব্রহ্মসূত্র ও বিবেকচূড়ামণি, অদ্বৈতানুভূতি এর মতো প্রকরণ গ্রন্থ পড়লেই বোঝা যায়। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীগণও একই পথে গমন করেছেন যা পঞ্চদশী, বেদান্তসার, সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ, অদ্বৈতসিদ্ধি, সংক্ষেপ শারীরক ইত্যাদি গ্রন্থ পড়লেও বোধ হয়। অদ্বৈতবেদান্তীদের এইরূপ Vedaism, Rationalism এবং Empiricism কে এক সাথে নিয়ে অদ্বৈতবেদান্তকে একটি সশক্ত দর্শনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তথা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের প্রামাণিকতার যৌক্তিক ভিত্তি প্রতিষ্টার্থেই আচার্য্যগণ তত্ত্বমসিকে লক্ষণার দ্বারা ব্যাখা করেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের কোন শাস্ত্রীয় ভিত্তি নেই বা এটা অদ্বৈতবেদান্তীগণের একান্ত নিজস্ব ব্যাখা। তত্ত্বমসির সমস্ত ব্যাখা শাস্ত্রীয়ই। অর্থাৎ পরিশেষে বলাই বাহুল্য যে, তত্ত্বমসি মহাবাক্যের শঙ্কর ও অন্যান্য অদ্বৈতবেদান্তীগণের ব্যাখা মনোকল্পিত নয় বরং প্রামাণ্য শ্রুতি স্মৃতির আলোকে যৌক্তিক ব্যাখা।

তথ্যসূত্র:

১) Paingala Upanishad Translated by Dr. A. G. Krishna Warrier
২) পরমার্থ জ্ঞানরত্নাকর - শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
৩) অধাত্ম রামায়ণ - শ্রীরামদাস
৪) গীতা গ্রন্থাবলী - শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৫) উপনিষদ গ্রন্থাবলী - প্রথম খন্ড - সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৬) সংক্ষেপ শারীরক - স্বামী জগদানন্দ
৭) শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা - শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জপমালায় দেব-দেবীর নাম জপ ও কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ

সুকান্ত চক্রবর্তী



জপমালা সাধকের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। যদিও তথাকথিত স্বঘোষিত বৈষ্ণব বাবাজী দের যথেচ্ছাচারে আজকাল হাটে-মাঠে, স্কুটারে চড়ে এমনকি প্রস্রাব করতে বসেও অনেকে এখন মালা জপ করেন। শুচি-অশুচির কথা তুললে তাঁরা ক্ষেপে যান। বলেন যেকোন জায়গায় মহামন্ত্র জপ করা যায়। তাদের উদ্দেশ্যেই মূলত এই আলোচনা!

সৃষ্টির আদিকাল থেকে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন ছাড়া কিছুই সম্ভব হয়নি। এই প্রকৃতির শক্তিকেই আমরা আদ্যাশক্তি বা মহামায়ার কৃপা বলছি। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর লাভ। কিন্তু এই ঈশ্বর লাভ খুব সস্তা নয় যা আমরা বুঝিয়ে থাকি। পারমার্থিক পথে যেতে হলে আপনাকে সংসারের সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করতে হবে এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাথে "যোগের" মাধ্যমে সম্মিলন ছাড়া এই বন্ধন ত্যাগ সম্ভবপর নয়। আর এই বন্ধনকে অনেকেই "ভব রোগ" হিসেবে আখ্যায়িত করে গেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বারবার "যোগযুক্ত" হবার কথা বলে গেছেন। যোগযুক্ত না হলে "ব্রহ্ম" এর সাথে সম্মিলন তথা জীবাত্মা-পরমাত্মা-র সংযোগ তথা ইহবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দু শাস্ত্র অন্তত অনেকাংশে তাই বলে।

এখন গুরুদেব বা প্রভুরা যখন জপ মালা দেন তখন তারা বলেন পারমার্থিক পথে উন্নতির জন্য এই জপ মালা। এই জপ মালা অনেকে বাজারের থলি হাতে, অনেকে গাড়িতে বসে,অনেকে পথের মধ্যে হেঁটে, অনেকে খেতে বসে জপ করতে থাকেন। উদ্দেশ্য যাতে ইহবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু জপমালার মাধ্যমে কিভাবে মুক্তি পাবো, তা তাঁরা বলেন না।

আসলে মানুষের মধ্যে যে সর্পাকৃতি "কুলকুন্ডলীনি" শক্তি আছে তার উন্মেষ ঘটিয়ে যদি জীবাত্মা-পরমাত্মার সাথে সংযোগ তথা "ব্রহ্মের" সাথে সংযোগ ঘটানো না যায় তবে জীবের মুক্তি মেলেনা এবং সে বন্ধন হতে মুক্তি পায়না। এখন এই "কুলকুন্ডলীনি " শক্তির উন্মেষের জন্য দুটি বিষয়ের প্রয়োজন।

১.যোগযুক্ত হওয়া

২.মহামায়ার কৃপা

এবার আসি কেন জপমালা তে ১০৮ তথা ১৮ সংখ্যাটি ব্যবহার করা হলো। শুধু জপমালা নয় বরং হিন্দুদের

ধর্মীয় শাস্ত্রে ১০৮ বা ১৮ সংখ্যাটির অশেষ গুরুত্ব। তার কিছু উল্লেখ দেখা যাক -

১.শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় অধ্যায় সংখ্যা--১৮
২.শ্রীমদ্ভাগবত এর শ্লোক সংখ্যা--১৮০০০
৩.কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ব্যাপ্তি কাল--১৮ দিন
৪.মহাপুরান এর সংখ্যা--১৮ টি
৫.উপপুরান এর সংখ্যা--১৮ টি
৬.মহাভারতের পর্ব সংখ্যা--১৮ অধ্যায়
৭.কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ১৮ অক্ষৌহিনী
৯.দূর্গাপূজায় ব্যবহার হয় ১০৮ টি পদ্মফুল0
১০.দেবীর গলায় পড়াতে হয় ১০৮ টি বেলপাতার মালা
১১.নারায়ন পূজায় তুলসী লাগে ১০৮ টি
১২.যে কোন যজ্ঞে আহূতী দিতে হয় ১০৮ টি
১৩.জপের মালায় "গুটি" র সংখ্যা ১০৮ টি
১৪.সংস্কৃত বর্নমালায় ৫৪ টি বর্ন রয়েছে।যার প্রতিটিতে "পুরুষ+প্রকৃতি" বিদ্যমান অর্থাৎ ৫৪*২=১০৮।
১৫.দিবামান কে "যাম" বা "প্রহর"বিবেচনা করে শাস্ত্রীয় কাজ করা হয়।এক প্রহর=১৮০ মিনিট।
১৬.এক " মূহুর্ত" সময় কে অতীত(৩৬)+বর্তমান(৩৬)+ভবিষ্যত(৩৬) দিয়ে গননা করা হয়, অর্থাৎ ৩৬+৩৬+৩৬=১০৮।
১৭.শ্রীকৃষ্ণের নাম ১০৮ টি
১৮.পঞ্চদেবতা(গনেশ,বিষ্ণু,শিব,দূর্গা,আদিত্য) এর সংকীর্তন এ নামের সংখ্যা ১০৮ টি।

এই এতোকিছুর পিছনে কারণ হচ্ছে ১৮ সংখ্যাটি "যোগ" সংখ্যা। যোগযুক্ত না হলে ব্রহ্মের সাথে সংযোগ সম্ভব নয় এবং পারমার্থিক উন্নতি সম্ভব নয়। আর ১৮ তথা ১(পুরুষ)+৮(প্রকৃতি) সংখ্যা দুটি কে যুক্ত করে রেখেছে ১+০+৮ বা "শূন্য" তথা ব্রহ্ম। শ্রী গীতায় অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলছেন - হে পার্থ! যদি কেউ ব্রহ্মের স্বাক্ষাৎ পায়, তবে তার সকল কর্মফল সাথে সাথে ই নাশ তথা "শূন্য" হয়ে যায়। তাই পুরুষ ও প্রকৃতি কে সংযুক্ত করে রেখেছেন শূন্য ব্রহ্ম যেটি লাভ হলে মানুষের সকল প্রারব্ধ নাশ হয়। তাই ১ এবং ৮



এর মাঝখানে যে "০" রয়েছে তা আসলে "পূর্ণ ব্রহ্মের" স্বরুপ। তাই নারায়ণ শীলা ব্যতিত কোন পূজাই হয় না এবং পবিত্রতা ছাড়া আপনি নারায়ণ শীলা ব্যবহার করতে পারবেন না। ঠিক এই কারণে শুদ্ধ, পবিত্র না হয়ে জপ করা যায় না।

কারণ জপ মালায় রয়েছে সর্পাকৃতি "কুলকুন্ডলীনি" শক্তির আধার। যার সঙ্গে যুক্ত ভাবে রয়েছে ব্রহ্ম তথা নারায়ণ। মহামায়ার কৃপা ছাড়া কুলকুন্ডলীনি শক্তিকে জাগ্রত করা সম্ভব নয় তাই মহামায়া কে যারা কারও দাসী হিসেবে অভিহিত করেন তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করেন কারণ মহামায়ার কৃপা ব্যতীত তাদের আরাধ্যকে লাভ করার চিন্তা করাও বৃথা।

সব জপমালা কিন্তু সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। মায়াতন্ত্রে দেবীর প্রশ্নের উত্তরে সদাশিব বলছেন -

পদ্মাক্ষে-শঙ্খ-রুদ্রাক্ষে-পুত্রজীবক-মৌক্তিকৈঃ। স্ফটিকৈর্ম্মণিরত্নৈশ্চ সৌবর্ণৈর্বিদ্রুমৈস্তথা।।
রাজতৈঃ কুশমূলৈশ্চ গৃহস্থস্যাক্ষমালিকা। অঙ্গুলীগণনাদেকং পর্ব্বণ্যষ্টগুণং ভবেৎ।।
পুত্রজীবৈর্দ্দশগুণং শতং শঙ্খৈঃ সহস্রকম্। প্রবালৈর্ম্মণিরত্নৈশ্চ দশসহস্রকং মতম্।
তদেব স্ফটিকং প্রোক্তং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে। পদ্মাক্ষৈর্দ্দশলক্ষং স্যাৎ সৌবর্ণৈঃ কোটিরুচ্যতে।
কুশগ্রন্থ্যা কোটিশতং রুদ্রাক্ষৈঃ স্যাদনন্তকম্। প্রবালৈর্ব্বিহিতা মালা প্রযচ্ছেৎ পুষ্কলং ধনম্।।

(মায়া তন্ত্র-২য় পটল-শ্লোক ১৫/১৬)

অনুবাদ - সদাশিব বলিলেন, হে দেবী! পদ্মবীজ, শঙ্খ, রুদ্রাক্ষবীজ, পুত্রজীবকবীজ, মুক্তা, স্ফটিক, সুবর্ণ ও বিদ্রুম প্রভৃতি মণিরত্ন, রৌপ্য বা কুশমূলদ্বারা মালা প্রস্তুত করিবেন। গৃহস্থগণ পদ্মবীজ ও রুদ্রাক্ষবীজের মালা ব্যবহার করিবে। জপসংখ্যা অঙ্গুলীপর্ব্বে গণনা করিলে অষ্টগুণ ফল লাভ হয়, পুত্রজীবকের বীজের মালায় জপ করিলে দশগুণ, শঙ্খমালায় জপ করিলে শতগুণ, প্রবালমালায় জপ করিলে সহস্রগুণ, মণিরত্ন বা স্ফটিক প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মালায় জপ করিলে দশসহস্রগুণ, মুক্তামালায় জপ করিলে লক্ষগুণ, পদ্মবীজ দ্বারা প্রস্তুত মালায় জপ করিলে দশলক্ষগুণ, সুবর্ণনির্ম্মিত মালায় জপ করিলে কোটিগুণ, কুশগ্রন্থিনির্ম্মিত মালায় জপ করিলে শতকোটিগুণ এবং রুদ্রাক্ষমালায় জপ করিলে অনন্তফল লাভ হয়। প্রবাল নির্ম্মিত মালায় জপ করিলে প্রচুর ধনলাভ হয়।

অতএব, যারা মানস জপ ভিন্ন জপমালা দিয়ে জপ করতে চান,তাঁরা শুদ্ধ পবিত্র দেহ ও মনে শাস্ত্র নির্দেশিত পথেই তা করুন।



নটরাজের ডমরু ও চতুর্দশ ধ্বনির সৃষ্টিতত্ত্ব

পৃথা সান্যাল

ভারতীয় দর্শনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর বিজ্ঞানসম্মত আধ্যাত্মিকতা। যেখানে শিল্প ও শাস্ত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় বরং একই পরম সত্যের দুটি পরিপূরক প্রকাশ। এই দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছেন 'নটরাজ', যিনি একাধারে সংহারক ও সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টির আদি-লগ্নে যখন মহাবিশ্ব নিস্তব্ধ ও স্থবির ছিল তখন মহাদেব তাঁর মহাজাগতিক তাণ্ডব নৃত্যের মাধ্যমে সেই স্থবিরতায় গতির সঞ্চার করেন। শৈব দর্শন মতে এই নৃত্য নিছক ধ্বংসের প্রতীক নয়; এটি এক সুশৃঙ্খল সৃষ্টির নান্দীমুখ। নৃত্যের সেই পরাকাষ্ঠার মহূর্তে নটরাজের হাতের ডমরু থেকে যে চৌদ্দটি ধ্বনিতরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়েছিল তাই মূলত এই জগতের যাবতীয় জ্ঞান ভাষা এবং তালের আদি উৎস। এই সম্পর্কে নন্দিকেশ্বর কারিকায় বলা হয়েছে–

নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্।।

অর্থাৎ, নৃত্যের অবসানে নটরাজ সনকাদি ঋষিদের উদ্ধারের কামনায় এবং জ্ঞানের প্রসারে নয় ও পাঁচ অর্থাৎ মোট চৌদ্দবার তাঁর ডমরু বাজিয়েছিলেন। এই চৌদ্দটি শব্দতরঙ্গই হলো 'শিবসূত্রজাল' বা 'মাহেশ্বর সূত্র'। মহর্ষি পাণিনি তাঁর কঠোর তপশ্চর্যার মাধ্যমে এই ধ্বনিগুলো শ্রবণ করেছিলেন এবং একে ভিত্তি করেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর কালজয়ী ব্যাকরণ গ্রন্থ 'অষ্টাধ্যায়ী'। ভাবলে অবাক হতে হয়, যে শব্দগুলোকে আমরা কেবল ভাষার একক বলে জানি, তার উৎস আসলে এক মহাজাগতিক নৃত্যের ছন্দ। এই ধ্বনিগুলো হলো:

১. অইউণ্,	২. ঋলৃক্,
৩. এওঙ্,	৪. ঐঔচ্,
৫. হয়বরট্,	৬. লণ্,
৭. ঞমঙণনম্,	৮. ঝভঞ্,

৯. ঘঢধষ্,	১০. জবগডদশ্
১১. খফছঠথচটতব্,	১২. কপয়্,
১৩. শষসর্,	১৪. হল্

এই আপাতমস্তক সংকেতগুলোই আসলে মহাবিশ্বের সমস্ত বর্ণের এবং শব্দের ডিএনএ, যা অত্যন্ত গাণিতিক শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত।

এই ধ্বনিগুলোর গঠনগত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম চারটি সূত্রের মাধ্যমে সমস্ত স্বরবর্ণকে এবং পরবর্তী দশটি সূত্রের মাধ্যমে ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। পাণিনি এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে 'প্রত্যাহার' নামক এক অনন্য সংক্ষেপণ পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানে আমরা যাকে 'অ্যালগরিদম' বা 'কোডিং' বলি, তার আদিম ও নিখুঁততম রূপ হলো এই মাহেশ্বর সূত্র। যেমন, 'অচ্' বললে সমস্ত স্বরবর্ণকে এবং 'হল্' বললে সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে বোঝানো হয়। এই যে বিশাল তথ্যকে ক্ষুদ্র সংকেতে রূপান্তর করার ক্ষমতা, তা প্রমাণ করে যে সংস্কৃত ব্যাকরণ কোনো আকস্মিক উদ্ভাবন নয়, বরং ডমরুর সেই আদি কম্পন থেকে নিঃসৃত এক নিখুঁত বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা। বিশ্বের অনেক ভাষাবিজ্ঞানীর মতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর জন্য সংস্কৃত একটি অত্যন্ত উপযোগী ভাষা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কারণ এর গঠন অত্যন্ত নিয়মবদ্ধ, গণিতভিত্তিক ও নির্ভুল।

নৃত্যের ক্ষেত্রে এই চৌদ্দটি ধ্বনি এক অনন্য আধ্যাত্মিক ও শৈল্পিক মাত্রা যোগ করে। ডমরুর সেই আদি স্পন্দন থেকেই তালের জন্ম, যা মাহেশ্বর সূত্রের ধ্বনিগত শৃঙ্খলার ওপর ভিত্তি করে নৃত্যের 'বোল' হিসেবে



বিবর্তিত হয়েছে। তান্ডব হলো সৃষ্টির শক্তির বহিঃপ্রকাশ আর সেই শক্তির গাণিতিক রূপ হলো এই ধ্বনিসমূহ। নটরাজ যখন ডমরু বাজান তখন তিনি মহাবিশ্বের 'কাল' বা সময়কে নিয়ন্ত্রণ করেন। ডমরুর প্রথম আঘাতটি ছিল সৃষ্টির আদি নাদ বা ওঙ্কার আর পরবর্তী তেরোটি আঘাত মহাবিশ্বের বিবর্তন ও পঞ্চভূতের বিকাশকে নির্দেশ করে। একজন নৃত্যশিল্পী যখন মঞ্চে পদচারণা করেন তিনি আসলে তাঁর শরীরের মুদ্রার মাধ্যমে সেই আদি চৌদ্দটি ধ্বনিকেই মূর্ত করে তোলেন। নৃত্যের তাল এবং ব্যাকরণের সূত্র এখানে একীভূত হয়ে যায় কারণ উভয়ই নিয়ন্ত্রিত হয় সেই এক ও অদ্বিতীয় স্পন্দনতত্ত্ব বা ভাইব্রেশন থিওরি দ্বারা।

বর্তমান কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার প্রেক্ষাপটে নটরাজের এই ডমরুধ্বনি এক নতুন তাৎপর্য পায়। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে এই জগতের প্রতিটি কণা আসলে এক একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে কাঁপছে, যাকে বিজ্ঞানীরা 'কসমিক ভাইব্রেশন' বা 'মহাজাগতিক স্পন্দন' বলে অভিহিত করেন। স্ট্রিং থিওরি অনুযায়ী মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম ভিত্তি হলো এক একটি কম্পনশীল তন্তু বা 'স্ট্রিং'। এই তন্তুগুলোর ভিন্ন ভিন্ন কম্পন থেকেই সৃষ্টি হয় বিচিত্র সব মৌলিক কণা যা কিছুটা, একটি বাদ্যযন্ত্রের তার থেকে নিঃসৃত ভিন্ন ভিন্ন সুরের মতো, যার আদি উৎস হিসেবে আমরা নটরাজের ডমরুর সেই মহাজাগতিক স্পন্দনকে কল্পনা করতে পারি।

এই দর্শনের আরও একটি গভীর দিক হলো 'স্ফোটবাদ'। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি শব্দের অন্তরালে এক একটি শাশ্বত শক্তি বা 'স্ফোট' লুকিয়ে থাকে। ডমরুর ধ্বনি যখন আমাদের অস্তিত্বে আঘাত করে, তখন তা আমাদের ভেতরের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করে। এই সূত্রগুলোকে 'অক্ষরসমাম্নায়' বা অক্ষরের পবিত্র সংকলন বলা হয় কারণ এগুলো পাঠ করলে বা এর ছন্দে নৃত্য করলে মানুষের শরীরের স্নায়বিক কেন্দ্র বা চক্রগুলো

উদ্দীপিত হয়। শরীর যেখানে মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ সেখানে ডমরুর এই চৌদ্দটি স্পন্দন আমাদের ব্যষ্টিগত চেতনাকে মহাজাগতিক পরম চেতনার সাথে যুক্ত করার সেতু হিসেবে কাজ করে।

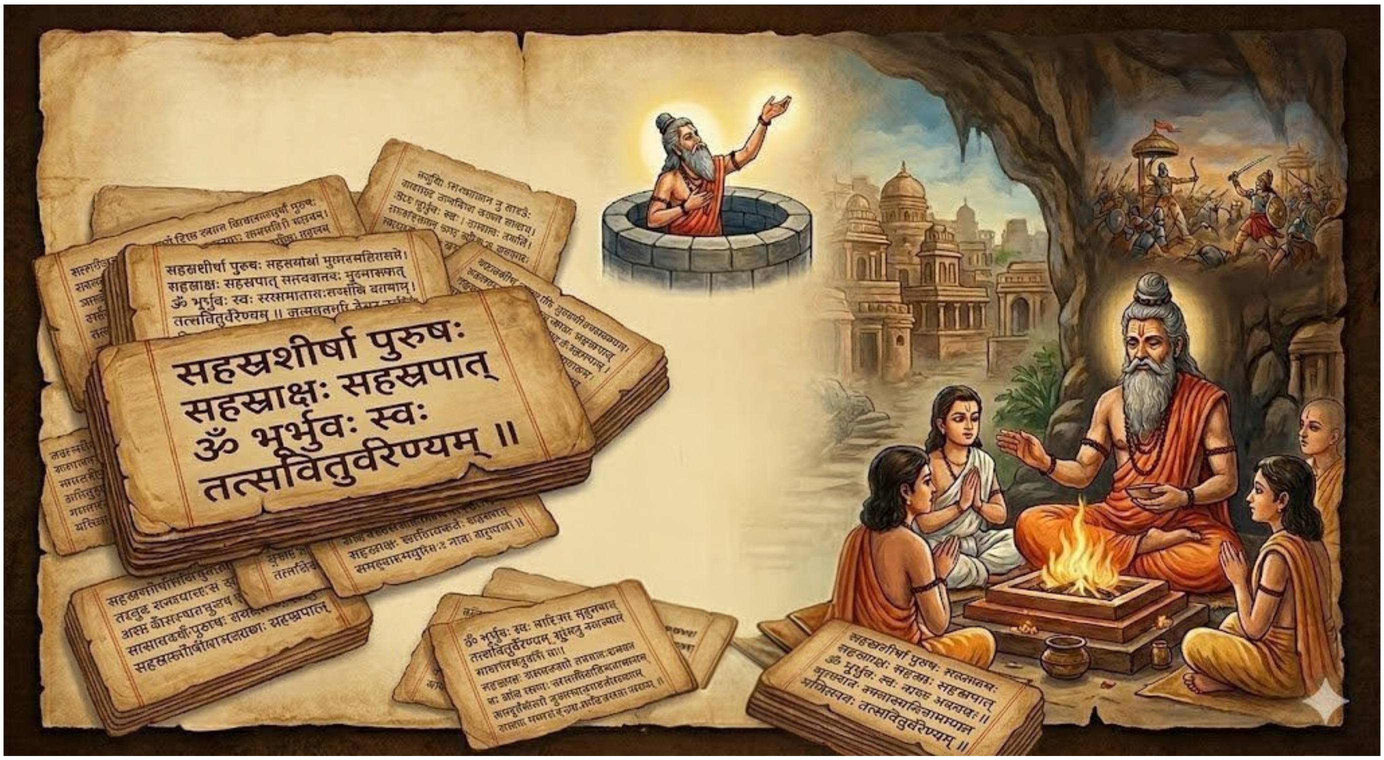
পরিশেষে বলা যায়, নটরাজের ডমরু থেকে নির্গত চৌদ্দটি ধ্বনি প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এটি দেখায় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অত্যন্ত সুসংগঠিত ও বিশ্লেষণভিত্তিক একটি ভাষিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এখানে শব্দের ধ্বনি ও গঠনকে পদ্ধতিগতভাবে শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা দেখা যায়, যা ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যাকরণ শব্দকে কাঠামো দেয় আর ভাষা সেই কাঠামোর মধ্যেই অর্থ প্রকাশ করে। এইভাবে প্রাচীন ভারতীয় ভাষাচিন্তা, ভাষা ও জ্ঞানের একটি সুসংহত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে যা আজও ভাষাবিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে আগ্রহের বিষয়।

তথ্যসুত্র -
১) নন্দীকেশ্বর কারিকা
২) বিভিন্ন আন্তর্জাল সূত্র

বেদে ইতিহাস

শৌনক রায় চৌধুরী

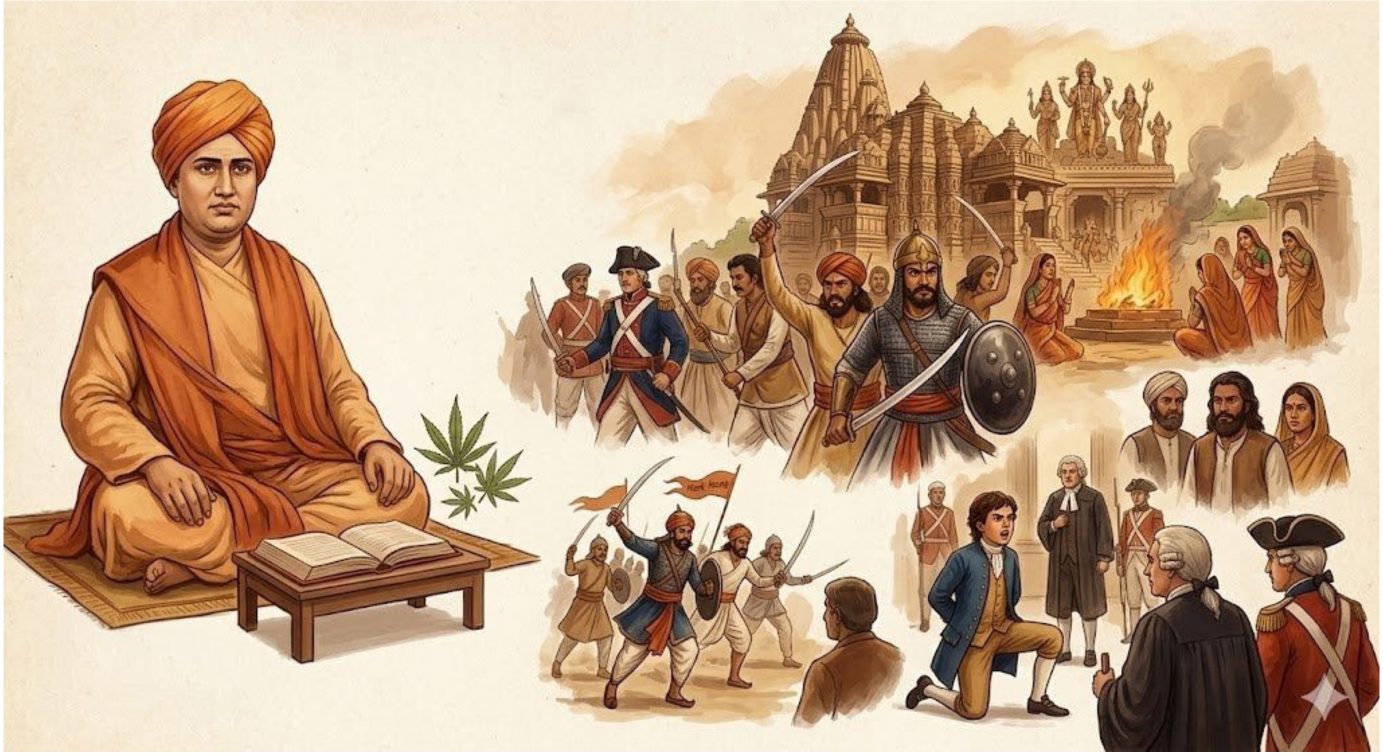
বেদে ইতিহাস আছে বা নেই, এই নিয়ে নানা মাধ্যমে বিভিন্ন অনার্ষ লেখ প্রকাশিত হয়েছে। এসবের জন্য সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। তাই তাঁদের বিভ্রান্তি কাটানোর জন্য আর্ষ প্রমাণের আলোকে সত্য উন্মোচন ও অনার্ষ পাখণ্ড খণ্ডনের জন্য এই লেখ লেখা হচ্ছে।
বেদে ইতিহাস আছে কি নেই, এটা বিচার করার জন্য আগে জানতে হবে বেদ কী আর ইতিহাস কী। বেদ কী



অর্থাৎ, বেদের সংজ্ঞা এইরূপ - 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্' (আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ২৪।১।৩১); মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম বেদ। বেদাঙ্গে প্রদত্ত এই সংজ্ঞা পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত। তার বিস্তারিত আলোচনা শাশ্বত সত্য পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় বেদসংজ্ঞাবিচারসমীক্ষা প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে।
এবারে দেখে নিই ইতিহাস কাকে বলে। অমরকোষের স্বর্গবর্গ অনুসারে, ইতিহ অর্থাৎ, পারম্পর্য উপদেশ, পুরাবৃত্ত অর্থাৎ, প্রাচীনকালের বৃত্তান্ত (পুরাবৃত্তোপনিবন্ধনোব্যাসোদিপ্রণীতো ভারতাদিগ্রন্থ ইতিহাসঃ, ইতিহশব্দঃ পারম্পর্যোপদেশোঽব্যয়ঃ, স অস্তেস্মিন্ ঘঞ্। পুরাবৃত্তোপনিবন্ধনপ্রায়ত্বাৎ পুরাবৃত্তৎ।) তা থাকায় মহাভারতকে ইতিহাস বলা হয়। অর্থাৎ ইতিহাস হল প্রাচীনকালের বৃত্তান্ত। আমাদের সাধারণ অনুধাবন অনুসারেও ইতিহাসের এই সংজ্ঞাই গৃহীত। এবারে এই সংজ্ঞা অনুসারে বেদে ইতিহাসের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিচার্য।
মনুস্মৃতি অনুসারে, বেদ থেকেই ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রচারিত (চাতুর্বর্ণ্যং, মনুস্মৃতি ১২।৯৭)। মনুস্মৃতির প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার মেধাতিথি এর টীকায় লিখেছেন, "ভূতমতীতং", অর্থাৎ এখানে ভূত শব্দের অর্থ অতীত বা ইতিহাস। দুর্জনতোষন্যায়ে এও বলে রাখা যাক যে, "বিশুদ্ধ মনুস্মৃতি" নামক অনার্ষ অশুদ্ধ খণ্ডিত জাল মনুস্মৃতি বইতেও এই শ্লোক গৃহীত।
কূপে পতিত ত্রিত ঋষির কাছে এই সূক্ত (ঋগ্বেদ শাকল সংহিতা ১।১০৫ সূক্ত) প্রতিভাত হয়েছিল। এই সূক্তের অষ্টম মন্ত্র উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, এই মন্ত্রে ইতিহাস, ঋক্, গাথা মিশ্রিত আছে (তত্র ব্রহ্মেতিহাসমিশ্রমৃঙমিশ্রং

গাথোমিশ্রং ভবতি, নিরুক্ত ৪।৬)। "কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩।১৫) এই শ্লোক অনুসারে বেদের অপর নাম ব্রহ্ম। নিরুক্তের প্রসিদ্ধ টীকাকার দুর্গাচার্য বলেছেন,
"তত্র ব্রহ্মেতিহাসমিশ্রম্"। তত্র তস্মিন্ সূক্তে ব্রহ্ম, ইতিহাসমিশ্রম্, ইতিহাসযুক্তমিত্যর্থঃ।
অর্থাৎ, সেই সূক্তে ইতিহাস যুক্ত আছে এই তার অর্থ (নিরুক্ত ৪।৬ দুর্গাচার্য টীকা)। অন্য টীকাকার স্কন্দস্বামী লিখেছেন, "পুরাবৃত্তমিতিহাসস্তেন মিশ্রম্" (নিরুক্ত ৪।৬ স্কন্দস্বামী টীকা) অর্থাৎ এই মন্ত্রে তথা বেদে পুরাবৃত্ত, প্রাচীনকালের বৃত্তান্ত, ইতিহাস মিশ্রিত আছে। নিরুক্তকার যাস্কাচার্য ও দুই প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার বেদে ইতিহাস থাকা বিষয়ে সহমত। স্কন্দস্বামী আরও লিখেছেন, "ত্রিতং চাত্র কল্পান্তরে য আসীৎ সোঽত্রাভিপ্রেতঃ" অর্থাৎ ঋষি ত্রিতও পূর্ব কল্পে ছিলেন, তা এখানে বলা হয়েছে (তদেব)।
আমরা স্মৃতি ও বেদাঙ্গ থেক বেদে ইতিহাসের উপস্থিতির পক্ষে প্রমাণ দেখালাম। বিপরীতে বেদে ইতিহাস নেই এমন কোনো প্রমাণ বেদাঙ্গ বা অন্যত্র পাওয়া যায় না। আরও প্রমাণ দেখুন, এবারে দুর্জনতোষন্যায়ে অনার্য সমাজী অনুবাদ থেকে প্রমাণ দিচ্ছি।
সমাজী দয়ানন্দ লিখেছেন, 'বর্তমান ও পূর্বতন সময়ের বিদ্বান......' (ঋগ্বেদ শাকল সংহিতা ১।১।২ দয়ানন্দকৃত অনুবাদ)। অর্থাৎ, বেদেও যে পূর্ব সময় অর্থাৎ ইতিহাস রয়েছে, তা তিনি স্বীকার করলেন।
শেষে আরও একটি প্রমাণ রইল। বেদের দুই ভাগ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, তা আমরাা পূর্বেই বলেছি। ব্রাহ্মণের মোট আটটা ভাগ রয়ছে। সেগুলো হল ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান এবং ব্যাখ্যান (যজুর্বেদ মাধ্যন্দিন বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৪।১০, শাঙ্করভাষ্য)। অর্থাৎ, বেদের অংশ রূপেই ইতিহাস স্বীকৃত, সেখানে বেদে ইতিহাস নেই এরকম আক্ষেপ করা নিতান্তই বালকবুদ্ধির পরিচয়।
তাই বেদে ইতিহাস রয়েছে, তা আবারও প্রমাণিত হল। পাঠকদের ধন্যবাদ জানাই। লেখায় কোনো ভুল থাকলে কঠোর সমালোচনা প্রার্থনা করি।

গ্রন্থপঞ্জি:
১) মনুস্মৃতি, মেধাতিথিভাষ্য সমলঙ্কৃতা, মনসুখরায় মোর, ৫, ক্লাইব রো, কলকাতা-১, ১৯৭১ খ্রি.
২) শ্রীস্কন্দস্বামীমহেশ্বর বিরচিতা নিরক্তভাষ্যটীকা, জ্ঞানপ্রকাশ শাস্ত্রী ও নরেশ কুমার সম্পাদিত, পরিমল পাব্লিকেশন্স, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯
৩) বৃহদারণ্যকোপনিষদ, সানুবাদ শাঙ্করভাষ্য সহিত, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর
৪) ঋগ্বেদ হিন্দী ভাষ্য, সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভা



আর্য সমাজঃ প্রশ্ন, প্রাসঙ্গিকতা ও পর্যালোচনা

(ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আর্যসমাজ)

শচীন্দ্র শর্মা

মধুলিকা আর্যা আমাদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

"মনে রাখবেন, যাঁকে আপনি অপমান করার চেষ্টা করছেন সেই ঋষি দয়ানন্দের কৃপাতেই আপনার মন্দির, উপনয়ন (যজ্ঞোপবীত), শিখা ও তিলক রক্ষা পেয়েছে। নচেৎ আপনি ও আমরা সবাই খ্রিস্টান বা মুসলমান হয়ে যেতাম এবং ভারত স্বাধীনও হতো না। আপনি কি জানেন না, হিন্দুদের রক্ষার জন্য আর্যসমাজীরাই সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছেন?"

শচীন্দ্র—ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ধরা হয়। মঙ্গল পাণ্ডে, রানি লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপি, বীর কুমার সিংহ, ঝলকারি বাঈ, রাও তুলারাম প্রমুখ— এঁরা কি আর্যসমাজী ছিলেন? এই স্বাধীনতা সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রাণ দিয়েছেন। কেউ দেবীর ভক্ত ছিলেন, কেউ বিষ্ণুর উপাসক, কেউ শিবকে মানতেন।

সে সময় স্বামী দয়ানন্দের বয়স ছিল প্রায় ৩৫ বছর। অর্থাৎ তিনি শিশু ছিলেন না, বৃদ্ধও ছিলেন না। এখন স্বামী দয়ানন্দ নিজে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে সে সময় তিনি কী করছিলেন—

"নদীতে ভেসে যাওয়া একটি মৃতদেহ দেখে আমি দ্রুত জলে নেমে সেটিকে ধরে তীরে নিয়ে এলাম। তারপর একটি ধারালো ছুরি দিয়ে যতটা পারি কেটে দেখা শুরু করলাম। আমি তার হৃদয় বের করে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলাম। এরপর হৃদয়কে নাভি থেকে পাঁজর পর্যন্ত কেটে সামনে রেখে বইয়ের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম। একইভাবে মাথা ও গলার অংশও কেটে সামনে রেখে পর্যবেক্ষণ করলাম।" (স্ব-লিখিত জীবনচরিত)

"দুর্ভাগ্যবশত সেই স্থানে আমার ভাঙ সেবনের অভ্যাস হয়ে যায় এবং তার প্রভাবে আমি প্রায়ই অচেতন হয়ে যেতাম।" (স্বামী দয়ানন্দের আত্মজীবনী)

"সেখানে একটি ষাঁড়ের মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। তখন আমি সেই মূর্তির ভিতরে ঢুকে পড়লাম এবং বাকি রাত সেখানে কাটালাম।" (স্বামী দয়ানন্দের আত্মজীবনী)

অর্থাৎ, যখন কানপুরে মূর্তিপূজক হিন্দুরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সহস্রে সহস্রে প্রাণ দিচ্ছিলেন, তখন স্বামী দয়ানন্দ একজন সন্ন্যাসী হয়েও একটি মৃতদেহ কেটে দেখার মতো কাজ করছিলেন। কেন? শরীরের নাড়ি খুঁজে বের করার জন্য। ভাগ্য ভালো যে তিনি মৃতদেহ চিরে আত্মা বা মন খুঁজতে যাননি, না হলে হয়তো বলতেন— "আত্মা বা মন বলে কিছুই নেই।"

যখন রানি লক্ষ্মীবাঈ, ঝলকারি বাইয়ের মতো নারীরাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন, তখন স্বামী দয়ানন্দ ভাঙ খেয়ে দিনের পর দিন অচেতন হয়ে পড়ে থাকতেন।

দিল্লিতে গণহত্যা চলছিল, ইংরেজরা সর্বত্র লড়াকু হিন্দুদের হত্যা করছিল। হিন্দুরাও পিছু না হটে সংগ্রাম করছিল। সেই সময় আর্যসমাজের স্বামী দয়ানন্দ ভাঙ খেয়ে ষাঁড়ের মূর্তির ভিতরে ঢুকে বসে ছিলেন।

তাহলে বলুন, এই ৩৫ বছর বয়সী স্বামী দয়ানন্দ মূর্তির ভিতরে ঢুকে কোন্ ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিলেন? বলা হয়— "আমরা তাঁকে অপমান করি।" আমরা আর কী অপমান করব, তিনি নিজ কর্মেই নিজেকে অপমানিত করেছেন!

এই স্বাধীনতা সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মারা গেছেন। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল হিন্দুরা, তারপর শিখ ও মুসলমান। সেই সময়ে তরুণ বয়সী স্বামী দয়ানন্দের অবদান কী ছিল? উত্তর - শূন্য।

সে সময় আর্যসমাজের অস্তিত্বই ছিল না। স্বামী দয়ানন্দ তখন অমর হওয়ার উপায় খুঁজছিলেন, ভাঙ খেয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন, গুরু পরিবর্তন করছিলেন, মৃতদেহ চিরে "বিজ্ঞানী" হওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

তাহলে, মধুলিকা আর্যা, এই মূর্তিপূজক হিন্দুরা কাদের প্রেরণায় যুদ্ধ করছিলেন?

মধুলিকা আর্যার দাবি -"স্বামী দয়ানন্দের কৃপায়ই মন্দির, উপনয়ন, শিখা ও তিলক রক্ষা পেয়েছে, নচেৎ সবাই মুসলমান বা খ্রিস্টান হয়ে যেত।"

কিন্তু বিদ্বান বন্ধুরা দেখুন - যিনি নিজে মূর্তিপূজাকে পাপ ও অধর্ম বলতেন, মূর্তি ভাঙার কথা বলতেন, তাঁর কারণেই মন্দির রক্ষা পেল, এর চেয়ে অযৌক্তিক কথা আর কী হতে পারে?

স্বামী দয়ানন্দ তাঁর আত্মজীবনীর শেষে লিখেছেন—

"আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন সর্বত্র আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মূর্তিপূজা প্রভৃতি দুষ্কর্ম দূর হয়।" (যোগীর আত্মচরিত)

স্বামী দয়ানন্দের জীবদ্দশায় ভারতে প্রায় ৭৫% মানুষ হিন্দু, প্রায় ২০% মুসলমান এবং ১% এরও কম খ্রিস্টান ছিল। তাই এই দাবি যে স্বামী দয়ানন্দ না থাকলে ৭৫% হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিস্টান হয়ে যেত - এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। অন্ধভক্তি ও মানসিক দাসত্ব সব সীমা অতিক্রম করে ফেলে। নিজের মাননীয় আচার্য স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে সর্বোচ্চ প্রমাণ করার জন্য মধুলিকা আর্যা সব রকমের মূর্খতার সীমা অতিক্রম করতে চান। তাঁর মতে স্বামী দয়ানন্দ না থাকলে পুরো একটি উপমহাদেশ নাকি বাধ্যতামূলকভাবে অন্য কোনো ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে যেত! স্বামী দয়ানন্দ কি স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন? এর উত্তর -"না"। কোনো প্রামাণিক ইতিহাসবিদের বইতেও তাঁর নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। স্বামী দয়ানন্দের প্রধান কাজ ছিল হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা করা এবং কিছু মুসলিম ও খ্রিস্টান পাদরিদের সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা করা, এর বেশি কিছু নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি কোনোভাবেই অংশ নেননি।

বরং স্বামী দয়ানন্দ বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করতেন এমনকি অনেকে দয়ানন্দকে ইংরেজদের গুপ্তচর ভাবত। তাঁর জীবনীতেই এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। "অনেক ইংরেজ সরকারি কর্মচারী স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে ও তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসতেন এবং তাঁকে প্রশংসা করতেন। স্বামী দয়ানন্দ ইংরেজ শাসনের অনেক প্রশংসা করতেন, তাই অনেক মানুষ তাঁকে ইংরেজদের গুপ্তচর বলেও মনে করত।" (স্বামী দয়ানন্দ জীবনচরিত)

পণ্ডিত লেখরাম রচিত স্বামী দয়ানন্দের জীবনীতে বলা হয়েছে,

"একজন ইউরোপীয় সংবাদদাতা লিখেছেন— 'এই ব্যক্তি (স্বামী দয়ানন্দ) কখনোই সরকারের বিরুদ্ধে কোনো

আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ভাবেননি; বরং তিনি তাঁর সভায় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ব্রিটিশ সরকারই এমন শাসন, যা ধর্মীয় বিষয়ে কখনো হস্তক্ষেপ করেনি, বরং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে।''' (লেখরাম রচিত জীবনচরিত)
স্বামী দয়ানন্দ বলতেন, 'ভারতের অনেক সম্পদ ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছে, কিন্তু এটি বন্দুকের গুলির মতো কাজ করবে - যত বেশি সম্পদ যাবে, ইংরেজরা ততই অলস ও ভোগবিলাসী হয়ে দুর্বল হবে।' (দয়ানন্দ জীবনী)
ভাবুন, যখন ইংরেজরা ভারত লুট করে সম্পদ নিয়ে যাচ্ছিল, তখন স্বামী দয়ানন্দ, এর মধ্যেও লাভের দিক দেখছিলেন।
অর্থাৎ, স্বামী দয়ানন্দ কখনো ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য দেননি। স্বামী দয়ানন্দ অনেক বই লিখেছেন— কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে বা স্বাধীনতার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো কোনো লেখা কি তিনি লিখেছেন? উত্তর -"না"।
পরবর্তীতে আর্যসমাজীরা তাঁকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবর্তক হিসেবে দেখানোর জন্য তাঁর নামে কিছু কথা যুক্ত করেছে - এমন অভিযোগও করা হয়েছে। যদিও বাস্তবে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো লেখা বা বক্তৃতা দেননি; বরং তাঁদের শাসনের প্রশংসাই করেছেন। এমনকি ইংরেজ সরকারের কাছে "নিয়োগ" সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের আবেদনও করেছিলেন বলে দাবি করা হয়। তাই মধুলিকা আর্যার এই বক্তব্য— "দয়ানন্দ না থাকলে আমরা স্বাধীনতা পেতাম না, বরং হিন্দুদের অস্তিত্বই শেষ হয়ে যেত", এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হিসেবে প্রমাণিত হয়।
স্বামী দয়ানন্দের জন্মের আগেই হিন্দুরা নিজেদের শিখা কাটেনি, বরং প্রাণ দিয়েছে; যজ্ঞোপবীত খুলে ফেলার বদলে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। তাঁর জন্মের আগেও এই দেশে নিজের ধর্ম, ভূমি ও মন্দির রক্ষার জন্য অসংখ্য হিন্দু প্রাণ দিয়েছেন।
আর্যসমাজীদের কেউ কেউ প্রশ্ন তোলে - যখন সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল, তখন দেবতারা কোথায় ছিলেন? হিন্দুরা কোথায় ছিল? লেখাটি দাবি করছে, তারা ইতিহাস জানে না। শুধুমাত্র সোমনাথ মন্দির রক্ষার জন্য হাজার হাজার ক্ষত্রিয় Mahmud of Ghazni-এর প্রায় ৫০,০০০ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। নিশ্চিত মৃত্যুর কথা জেনেও তাঁরা যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের পরিবারের নারীদেরও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন। এই এক মন্দির রক্ষার জন্যই বহু সহস্র হিন্দু, বিশেষ করে ক্ষত্রিয়রা, যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিলেন। তারা নিজেদের ধর্ম ও মন্দির রক্ষার জন্য লড়ে মৃত্যুবরণ করতেন, আর তাদের নারীরা আগুনে আত্মাহুতি দিতেন। সোমনাথ মন্দিরের পবিত্র প্রাচীর স্পর্শ করে হিন্দুরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে যেত। গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে "হর হর মহাদেব" ধ্বনি তুলে ক্ষত্রিয়রা যবনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। একজন রাজপুত যোদ্ধা যেন একাই দশজন যবনকে পরাস্ত করছিল। গোপা-বাপা প্রমুখ যোদ্ধারা আত্মীয়-স্বজনসহ নিজেদের সম্পূর্ণ বংশসহ আত্মোৎসর্গ করেছিলেন— এই মন্দিরের রক্ষা, ধর্মের সম্মান ও গৌরবের জন্য। এদিকে পুরুষদের মৃত্যুর পর দুর্গে রাজপুত বীরাঙ্গনারা বধূর সাজে সজ্জিত হয়ে, মঙ্গলগান গেয়ে, হাসতে হাসতে জ্বলন্ত চিতায় উঠে আত্মাহুতি দিতেন। মধুলিকা সমাজী যখন বলেন যে এই দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি ত্যাগ আর্যসমাজীরা করেছেন— তখন কি তিনি একটুও লজ্জা বোধ করেননি? এই লাখো হিন্দু, যোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের স্পষ্ট আত্মবলিদানকে কি এটি অপমান নয়?
তাঁদের দয়ানন্দ তাঁর সত্যার্থ প্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখে গেছেন যে, যখন সোমনাথ মন্দির ভাঙা হচ্ছিল তখন হিন্দুরা শুধু প্রার্থনা করছিল, কোনো প্রতিরোধ করেনি— এবং এই লেখা অনুযায়ী এটাই সিদ্ধ হচ্ছে যে এটি ভ্রান্ত ইতিহাস, যা অনেকে বিশ্বাস করে নিয়েছে। আজও কিছু দয়ানন্দের অনুসারীরা এই কথাই বিভিন্ন স্থানে পুনরাবৃত্তি করে।
এই লেখার মতে, তাদের উচিত প্রকৃত ইতিহাস পড়া— একটি ধর্মস্থান রক্ষার জন্য এত ভয়াবহ যুদ্ধ পৃথিবীর অন্য কোথাও হয়তো হয়নি। বহুদিন ধরে তীব্র যুদ্ধ চলেছিল। শুধু যোদ্ধা নয়, সাধারণ হিন্দুরাও অংশ নিয়েছিল— প্রায় ৬০ হাজার হিন্দু এই মন্দিরের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যখন Mahmud of Ghazni-কে থামানো যায়নি, তখনও পুরোহিতরা শিবলিঙ্গ ছেড়ে পালাননি— তারা মন্দিরেই প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। এরপরও যুদ্ধ চলতে থাকে। মাহমুদের পক্ষে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়াও কঠিন হয়

পড়েছিল। যুদ্ধের জয়-পরাজয় থাকেই— আমাদের পরাজয়েরও নানা কারণ ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো— আমরা কি লড়িনি? আমরা কি মরিনি? আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ও মন্দির রক্ষার এইসব আত্মত্যাগকে কিছু আর্যসমাজী 'দোকানদারি' বলে অভিযোগ করেন ।
মহারাণা প্রতাপ সিং, শিবের উপাসক ছিলেন— তিনি কি আর্যসমাজী ছিলেন?
ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, মা ভবানীর ভক্ত ছিলেন— তিনি কি আর্যসমাজী ছিলেন?
মহারাজা ছত্রশাল, কৃষ্ণভক্ত ছিলেন— তিনি কি আর্যসমাজী ছিলেন?
দুর্গাদাস, হেমু প্রমুখদের নেতৃত্বে ধর্ম ও দেশের জন্য লড়ে মারা লক্ষ লক্ষ হিন্দু— তারা কি আর্যসমাজী ছিলেন? হলদিঘাটি, চিতোর, দাক্ষিণাত্য— কত যুদ্ধই না হয়েছে! আর্যসমাজ তো মাত্র প্রায় ১৫০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত— তারা কোন যুদ্ধ করেছে? এমন কি কোনো ঘটনা আছে যেখানে কোনো আর্যসমাজীকে ধর্মান্তরের জন্য নির্যাতন করা হয়েছে? উত্তর -"না"।
'হকিকত রায়' ছিলেন মাত্র ১১/১২ বছরের একটি শিশু। তার বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ আনা হয়। কাজির কাছে বিচার হয়। তাকে বলা হয় - দুটি পথ: ইসলাম গ্রহণ করো, বেঁচে যাবে; না হলে মৃত্যুদণ্ড। হকিকত রায় তা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে। তার মা কাঁদতে কাঁদতে বলে -"বাবা, মুসলমান হয়ে যা, অন্তত বেঁচে তো থাকবে।"
তখন সে বলে -"মা, নিজের ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হওয়া কি মৃত্যুর চেয়ে কম? আমার কাছে তা বহু মৃত্যুর চেয়েও কঠিন। রামের নাম ছেড়ে কীভাবে কলেমা পড়ব? মন্দির ছেড়ে কীভাবে মসজিদে যাব?"
এই ছোট্ট ছেলেটি প্রাণভিক্ষা চায়নি, ধর্ম ত্যাগ করেনি— বুক চিতিয়ে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছিল। শেষে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয় এবং শিরশ্ছেদ করা হয়।
এমন ঘটনা একটি-দুটি নয়, হাজার হাজার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে ইতিহাসে, যেখানে শিশু ও নারীরাও ধর্ম ত্যাগ না করে মৃত্যুবরণ করেছে। হিন্দুরা ভয়াবহ নির্যাতনের সময়েও যখন ধর্ম না বদলালে শরীরে পেরেক ঢোকানো হতো, করাত দিয়ে কাটা হতো - তখনও নিজেদের ধর্ম রক্ষা করেছে।
স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কি কখনো ইংরেজদের হাতে বেত্রাঘাত পেয়েছিলেন? কখনো কারাবন্দী হয়েছিলেন? এমন কোনো উদাহরণ নেই। বরং বলা হয়েছে, ইংরেজদের কাছ থেকে তিনি উপকারই পেয়েছেন।
হিন্দুরা ইসলামী অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা, রক্তপাত ও কঠোর নির্যাতনের সময়ও টিকে ছিল; মাথা কেটে দুর্গের প্রাচীরে টাঙানো, ফুটন্ত তেলে দগ্ধ করা - এমন নানান নির্যাতনের মধ্যেও তারা লড়েছে এবং ধর্ম ত্যাগ করেনি।
আজ তারা এসব ভুয়া লেখা লিখে দাবি করে - দয়ানন্দ না থাকলে দেশ থাকত না, ধর্ম থাকত না..... এদের চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী আর কেউ হতে পারে কি? তাদের এই কয়েকটি কথার মাধ্যমে এই দেশের জন্য ধর্ম ও দেশের রক্ষায় আত্মবলিদান করা লক্ষ লক্ষ হিন্দুর অপমান করা হয়। এই লোকদের ইতিহাস যেন শুরুই হয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে।
পাইক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ভীল বিদ্রোহ, মারাঠা যুদ্ধ, রাজপুত প্রতিরোধ - এসবের ইতিহাস পড়ুন। ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ কোনো একক সংগঠন ছাড়াই লড়াই করে আত্মবলিদান দিয়েছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাস পড়ুন, যে সংগ্রাম প্রায় চল্লিশ বছর ধরে চলেছিল। সন্ন্যাসী সাধুরা যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন। আর কত বলব, কী-ই বা বলব?
হিন্দু সমাজ, হিন্দু ধর্ম এবং এই দেশের রক্ষা কোনো এক ব্যক্তি, কোনো এক গুরু বা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের অবদান নয়। এটি হাজার হাজার বছরের সম্মিলিত সংগ্রাম, ত্যাগ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের ফল। সৃষ্টির শুরু থেকে মহাভারতের যুদ্ধের সময়কাল, তারপর গুপ্ত যুগ, মধ্যযুগ - সব সময়েই আমরা কোনো একক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির ওপর নির্ভর না করে নানা আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে লড়েছি।
এটি অসংখ্য পরিচিত-অপরিচিত বীর, সাধক, নারী ও সাধারণ মানুষের অবিরাম সংগ্রাম, ত্যাগ ও বিশ্বাসের ফল। এটিকে রক্ষার কৃতিত্ব কোনো এক ব্যক্তিকে দেওয়া মানে সেই অসংখ্য আত্মত্যাগকে অপমান করা।
"এই ধর্ম কোনো এক ব্যক্তি বা সংগঠনের দ্বারা গড়ে ওঠেনি, তাই কোনো এক ব্যক্তি বা সংগঠন না থাকলেও এটি ধ্বংস হয়ে যাবে না।"

রাঢ়বঙ্গের ধর্মঠাকুর – ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় স্বরূপ

সপ্তর্ষি পাহাড়ী



ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ রাঢ় তথা গৌড় অঞ্চলের প্রধান হিন্দু দেবতা। ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে পাঁচালি সাহিত্যও রচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত ধর্মমঙ্গল কাব্যের কথা উল্লেখ করতে হয়। ধর্মঠাকুরের পালাগান লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রান্তিক মানুষ রোগ-শোক থেকে মুক্তি পেতে এবং বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা থেকে মুক্তির আশায় তাঁর পূজা করেন। ধর্মঠাকুর কে বা তাঁর স্বরূপ কী—এ নিয়ে লোকগবেষকদের নানারকম তত্ত্ব রয়েছে।

আমাদের দেশের তথাকথিত ঐতিহাসিকেরা ধর্মরাজকে প্রাথমিকভাবে বৌদ্ধ বলে মনে করলেও, পরবর্তীকালে নীহাররঞ্জন রায়ের মতো ঐতিহাসিক প্রমাণ করেছেন যে ধর্মরাজের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের কোনো সংযোগ নেই। তিনি এই পূজোকে অনার্য পূজো বলেছেন। কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যে এতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাগে না। তবে এই যুক্তি কতটা ঠিক, সে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সারা ভারতে অনেক মন্দির রয়েছে যেখানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই; তাঁরা পরম্পরা অনুযায়ী পূজো করেন। কুলাচার ও দেশাচারকে মান্যতা স্বয়ং মনু দিয়েছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

"ধর্ম, যিনি সর্বোচ্চ দেবতা, সৃষ্টিকর্তা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের থেকেও উচ্চতর, এবং কখনো কখনো তাঁদের সঙ্গে অভিন্ন হিসেবে চিহ্নিত। তাঁর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের কোনো বিমূর্ততা নেই।"

শুধু তাই নয়, ধর্মঠাকুর শুভ্র নিরঞ্জন। আদিম লোকদের বিশ্বাস ছিল সূর্যের রং সাদা এবং তার বাহন ঘোড়ায় টানা রথ। এ থেকে সূর্যের প্রতীক ধর্মকেও শুভ্র বলে মনে করা হয় এবং তাঁর পূজোর সময় তাঁকে কাঠের ঘোড়ায় চড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজোর সময় মাটির ঘোড়া উপহার দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত আছে। ধর্মঠাকুরের বাহন সাদা ঘোড়া এবং সাদা ফুল তাঁর প্রিয়। তাঁর আসল প্রতীক পাদুকা।

কী বুঝলেন তবে? যে দেবতার বাহন ঘোড়া, তিনি আর যাই হোন অনার্য দেবতা নন। কারণ আর্য আগমন তত্ত্ব অনুযায়ী আর্য জাতি ভারতে ঘোড়া নিয়ে আসে। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেল ধর্মরাজ না অনার্য দেবতা, না বৌদ্ধ দেবতা। দেখুন, হিন্দু শাস্ত্র মতে সূর্যদেব সাদা ঘোড়ায় টানা রথে ভ্রমণ করেন, যা লোকমতে ধর্মরাজের সঙ্গে মিলে যায়।

তবে এখানে আরও একটি আপত্তি আছে। অনেকে বলেন, ধর্মমঙ্গল ছাড়া আর কোনো মূল হিন্দু শাস্ত্রে নাকি ধর্মরাজের নাম বা পূজোর উল্লেখ মেলে না। এমনকি গুগল সার্চও তাই বলছে। আমি পূর্বে অনেকবার বলেছি, এবারও বলছি—শাস্ত্র বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে গুগলে না খুঁজে পরম্পরাগত গুরুদের কাছে যান।

আমি পুরাণ নয়, একদম স্মৃতি শাস্ত্র থেকেই প্রমাণ দিচ্ছি। বিষ্ণু স্মৃতির ৯০ অধ্যায়ের ২৮তম শ্লোকে বলা হচ্ছে—

"চতুর্দশীতে নদীর জলে স্নান করে ধর্মরাজ পূজো দিলে সব পাপ মুছে যায়।"

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, স্মৃতির স্থান বেদের পরেই। এবং ঐতিহাসিকভাবে বিষ্ণু স্মৃতি প্রায় ২০০০ বছর আগে লেখা। ধর্মঠাকুর কিংবা ধর্মরাজ সম্পূর্ণভাবে একজন বৈদিক হিন্দু দেবতা। তাই শুধুমাত্র হিন্দুরাই তাঁর পূজো করেন। শুধু তাই নয়, স্মৃতিশ্রেষ্ঠ মনুস্মৃতিতেও ধর্মঠাকুরের কথা উল্লেখ রয়েছে। মনুস্মৃতি ৯.১২৯-এ বলা হয়েছে যে প্রজাপতি নিজের দশ কন্যার বিবাহ ধর্ম দেবের সঙ্গে দেন। অর্থাৎ, ধর্ম দেবের পূজা হিন্দুরা আদি বৈদিক যুগ থেকে করে আসছেন। হিন্দুদের যেকোনো সংস্কৃতিকে বৌদ্ধ কিংবা অনার্য বলে দাগিয়ে দেওয়া বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এবার তথাকথিত বৌদ্ধ গ্রন্থ শূন্য পুরাণ দেখা যাক। শূন্য পুরাণ এক বৌদ্ধ গ্রন্থ হলেও এর লেখক রামাই পণ্ডিত নিজ পরিচয় দ্বিজ রূপেই দিয়েছেন—

"পণ্ডিত দ্বিজ রাম সকলি গুণধামে"

যদিও শূন্য পুরাণ বৌদ্ধ গ্রন্থ, তবুও ধর্মঠাকুরের আচার তারা হিন্দু আচার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি।
শূন্য পুরাণ অনুযায়ী—

যত দূর ধর্ম্মের ওঁকার জানে।
গারস্তর মহাপাপে দূরত পলানে॥
সাম যজু ঋক অথর্ব্ববেদে।
ওঁকার লইয়া ধর্ম্মের পঞ্চম বেদে।।

ধর্ম্মের ওঁকার: ধর্মের মূল ধ্বনি বা 'ওঁকার' যেখানে বিরাজ করে, সেখান থেকে গৃহস্থের যাবতীয় মহাপাপ ও অমঙ্গল দূরে পালিয়ে যায়।

পঞ্চম বেদ: প্রচলিত চারটি বেদ (সাম, যজু, ঋক, অথর্ব) ছাড়াও 'ওঁকার' বা ধর্মের এই বিশেষ জ্ঞানকে এখানে 'পঞ্চম বেদ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়—

দেখ ঘর দানপতি সুপ্রসন্ন বারমতি। / ধন বংশ মঙ্গল করএ জুগপতি॥
জতেক দেবতাগণে জাবে জে বাহনে। / ধর্ম্মের জন্ম বল্যে সভে হরসিত মনে॥
হংসপৃষ্ঠে আরোহন ব্রহ্মা জুগপতি। / গড়ুর বাহনে নারায়ন কৈল স্থিতি॥
বলদ বাহনে হর করিয়া সাজন। / সহিত গমনে জাইল্যা ধর্ম্মের গাজন॥
জেমন আছিল পূর্ব্বে দেব নিবন্ধিত। / বসিষ্ঠ নারদ আইল কুলপুরোহিত॥
আইল্যা কপিল মুনি পরভুর সাক্ষাতে। / ইন্দ্র সুরপতি আইল্যা চাপি ঐরাবতে॥
অগস্ত পুলস্ত আর বাল্মিক আপুনি। / কুবের বরুন আইল্যা জত সব মুনি॥
চন্দ্র সূর্য্য আইলাকে গ্রহ তারাগনে। / ধন্য হরিচন্দ্র ধন্য অমরা ভুবন॥

আধুনিক বাংলায় সহজ অর্থ—
এই অংশটি মূলত একটি শুভ অনুষ্ঠানের (ধর্মের গাজন বা ঘর দেখা) বর্ণনা। এখানে বলা হচ্ছে—
দেবতাদের সন্তুষ্টি: দানপতি (যিনি দান করেন বা যজ্ঞের মালিক) ঘরটি দেখছেন এবং যুগপতি (ধর্মঠাকুর) সকলের ধন-সম্পদ ও বংশের মঙ্গল করছেন।

দেবগণের সমাগম: ধর্মঠাকুরের জন্ম বা মহিমা উদযাপনে দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত মনে নিজেদের বাহনে চড়ে আসছেন। বাহনসহ দেবতাদের রূপ -

ব্রহ্মা এসেছেন হংসে চড়ে।
নারায়ণ (বিষ্ণু) এসেছেন গরুড়ের পিঠে।

হর (শিব) ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ধর্মঠাকুরের 'গাজন' উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছেন।
ঋষিদের আগমন: শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী কুলপুরোহিত হিসেবে বশিষ্ঠ ও নারদ ঋষি এসেছেন। এছাড়া কপিল মুনি, অগস্ত্য, পুলস্ত্য এবং স্বয়ং বাল্মীকি ঋষিও উপস্থিত হয়েছেন।
স্বর্গীয় পরিবেশ: দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে এসেছেন। কুবের, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহ-তারাদের আগমনে পুরো মর্ত্য যেন অমরাবতীর মতো ধন্য ও পবিত্র হয়ে উঠেছে।
নাস্তিক বৌদ্ধ দর্শনে হিন্দুদের সঙ্গে পরাজিত হয়ে অনেকেই হিন্দু দেবদেবীর পূজা শুরু করেন। এই কারণেই শূন্য পুরাণের মতো বৌদ্ধ গ্রন্থেও হিন্দু রীতি মেনেই ধর্মপূজা হয়।
এখন প্রশ্ন হলো—যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী ঐতিহাসিক ধর্মপূজাকে অনার্য বলে থাকেন, তার ভিত্তি কী?
ধর্মঠাকুরের উল্লেখ ও রীতিনীতি যে সমস্ত গ্রন্থে রয়েছে এবং যা লোকাচারে প্রচলিত, তার সবই বৈদিক মতের। কেউ কেউ এটিকে পৌরাণিক বললেও তাতে ক্ষতি নেই; উপনিষদ ও পুরাণকেও কখনো কখনো পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে।
ধর্মঠাকুরের পূজো সম্পর্কে শূন্য পুরাণে বলা হয়েছে—

"রামাই পণ্ডিত আইল সোলসঅ গতি।
হোমযজ্ঞ করি দিল তামব আঙ্গুরী॥ ৭
হোমযজ্ঞ অধিবাসে মন্ত্র আবাহন।
বামুন পণ্ডিত আইল দেব নিরঞ্জন॥ ৮
পঞ্চম দুআরে আজি শুনব বারতা।
গোসাঞী পণ্ডিত আইল অহন্যেক গতি॥
হোম যজ্ঞ করি দিল তামর আঙ্গুরী॥ ৯
পরভুর চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীজুত রামাই রচিল মধুর সঙ্গীত॥ ১০"

আধুনিক অর্থ—
পূজার সূচনা: রামাই পণ্ডিত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পূজা প্রাঙ্গণে এলেন এবং তামা দিয়ে তৈরি আংটি বা বিশেষ উপকরণ ব্যবহার করে হোমযজ্ঞ সম্পন্ন করলেন।
হ্যাঁ, হোমযজ্ঞ। কোনো অনার্য সংস্কৃতি হোমযজ্ঞ করে? এখন কেউ বলতে পারেন—"আমার গ্রামে তো হয় না।" ভাই, টাকা-পয়সার অভাবে ব্রাহ্মণ নিত্য হোম করতে পারেন না; গ্রামে অধিকাংশ মন্দিরেরই সেই অবস্থা। তাতে পূজোর অবৈদিকতা প্রমাণিত হয় না।
পূজাবিধিতে সামগ্রীর অভাবে গায়ত্রী পাঠেই পূজা হয়, আর ব্রাহ্মণ না থাকলে প্রণাম করেই মা-বোনেরা পূজা সেরে নেন।
এবার আসুন দেখে নেওয়া যাক ধর্মকাব্যগুলির মতে সৃষ্টি কীভাবে হলো।



শূন্য পুরাণ বলছে—

নহি ছিষ্টি ছিল আধ নাহি সুর নর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ন ছিল ন ছিল আঁবর ॥ ৭
সবগ মরত নাহি ছিল সভি ধুন্ধুকার ॥ ৯
দসদিকপাল নাহি মেঘ তারাগণ।
আউ মিত্যু নাহি ছিল জমব তাড়ন ॥ ১০
সূক্ষ্মত ভরমণ পরভুর সূক্ষ্মে করি ভব।

তখন কোনো সৃষ্টি বা জগতের অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি দেবতা (সুর) বা মানুষ (নর)—কেউই ছিল না। সেই অবস্থায় পরম প্রভু কেবল তাঁর অতি সূক্ষ্ম রূপে অবস্থান করছিলেন এবং সেই সূক্ষ্ম সত্তার মধ্যেই ভাবমগ্ন ছিলেন।

ধর্মমঙ্গল বলেছে—

একব্রহ্ম সনাতন, নিরাকার নিরঞ্জন,
নির্গুণ নিদানে শূন্যভরে।
দেখি সব অন্ধকার, সচিন্তিত কর তাঁর,
নাহি সৃষ্টি কেমনে সঞ্চরে ॥ ৮৫॥

আধুনিক বাংলায় অর্থ:
সৃষ্টির আগে একমাত্র চিরন্তন, আকারহীন, পবিত্র এবং গুণাতীত ব্রহ্ম (ঈশ্বর) মহাশূন্যে বিদ্যমান ছিলেন। চারপাশে তখন শুধু ঘোর অন্ধকার।"

মনুস্মৃতি এবং ঋগ্বেদের সেই গূঢ় দর্শন কীভাবে বাংলার ধর্মমঙ্গল ও শূন্যপুরাণ-এ প্রতিফলিত হয়েছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

১. অন্ধকার ও অবর্ণনীয় শূন্যতা

ঋগ্বেদের বিখ্যাত নাসদীয় সূক্তে বলা হয়েছে, শুরুতে "অন্ধকার অন্ধকার দ্বারা আবৃত ছিল" (তম আসীৎ তমস গূঢ়মগ্রে)। ঠিক এই সুরটিই আমরা পাই ধর্মমঙ্গল-এর সেই পঙক্তিতে— "দেখি সব অন্ধকার, সচিন্তিত কর তাঁর"। আবার শূন্যপুরাণ-এ একে বলা হয়েছে "সভি ধুন্ধুকার" (সবই ঝাপসা বা অন্ধকার)। মনুস্মৃতির (১.৫) ভাষায় পৃথিবী তখন ছিল প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন এক নিস্পন্দ আঁধার।

২. দেবতাকুল ও পঞ্চভূতের অনুপস্থিতি

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, সৃষ্টির পূর্বে কোনো নাম বা রূপ ছিল না। শূন্যপুরাণ এই দর্শনকে আরও সহজ বাংলায় ব্যক্ত করেছে, তখন ব্রহ্মা বা বিষ্ণু ছিলেন না, ছিল না কোনো "আঁবর" বা আকাশ। এমনকি চন্দ্র-সূর্য (রবি-শশী), স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল - সবই ছিল অনুপস্থিত। এই যে "কিছুই না থাকা"-র বর্ণনা, এটি আসলে ঋগ্বেদের সেই দর্শনেরই প্রতিফলন যেখানে বলা হয়েছিল, তৎকালে "সৎ" (অস্তিত্ব) বা "অসৎ" (অনস্তিত্ব) কিছুই ছিল না।

৩. নিরাকার ব্রহ্ম ও সৃষ্টির সংকল্প

মনুস্মৃতি (১.৬) অনুযায়ী, সেই অন্ধকার ভেদ করে স্বয়ম্ভু ভগবান তাঁর দিব্য জ্যোতি নিয়ে আবির্ভূত হন। আপনার দেওয়া ধর্মমঙ্গল-এর টীকায় ঠিক একই কথা বলা হয়েছে—ঈশ্বরের কেবল "জ্যোতি বা আভা" বর্তমান ছিল। যখন সেই নিরাকার পরমেশ্বর "সচিন্তিত" হলেন, তখনই সৃষ্টির প্রথম স্পন্দন বা "সঞ্চার" শুরু হলো। শূন্যপুরাণের ভাষায়, প্রভু তখন নিজের "সূক্ষ্ম" রূপের মধ্যে নিজেই ভ্রমণ করছিলেন বা ভাবমগ্ন ছিলেন।

৪. সময়ের ঊর্ধ্বে পরম সত্তা

বৈদিক সাহিত্যে পরমাত্মাকে বলা হয়েছে কাল বা সময়ের ঊর্ধ্বে। শূন্যপুরাণ এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছে এভাবে—তখন কোনো "আউ" (আয়ু) বা মৃত্যু ছিল না, তাই যমের কোনো তাড়নাও ছিল না। মৃত্যুহীন, সময়হীন সেই শূন্যতায় কেবল "একব্রহ্ম সনাতন" বিরাজ করছিলেন। কিছু ঐতিহাসিক এই শূন্য কে বৌদ্ধ শূন্য বাদের সাথ যুক্ত করেন কিন্তু যাকে বৌদ্ধ মনে করছেন, তা মূলত ছদ্মবেশে বৈদিক দর্শন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব (Theistic Presence): বৌদ্ধ শূন্যবাদ অনুযায়ী মহাবিশ্বের মূলে কোনো স্রষ্টা নেই (Nihilism/Emptiness)। কিন্তু এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে— "একব্রহ্ম আছেন গোঁসাই"। অর্থাৎ শূন্যতা এখানে খালি জায়গা নয়, বরং ঈশ্বরের বাসস্থান।
সৃষ্টির সংকল্প (Divine Will): বৌদ্ধধর্মে জগত অনাদি। কিন্তু আপনার পাঠে ঈশ্বর অন্ধকার দেখে "সচিন্তিত" হচ্ছেন এবং সৃষ্টি "সঞ্চার" করছেন। এই 'চিন্তা' বা 'সংকল্প' থেকে সৃষ্টি হওয়া সরাসরি মনুস্মৃতির (১.৮) দর্শনের প্রতিফলন।
সূক্ষ্ম সত্তার বিচরণ: বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী আত্মা বা সত্তা বলে কিছু নেই। অথচ এখানে প্রভু তাঁর "সূক্ষ্ম" রূপে বিচরণ করছেন— "সূক্ষ্মত ভরমণ পরভুর সূক্ষ্মে করি ভব"। (শূন্য পুরান); এটি মনুস্মৃতির (১.৭) "সূক্ষ্মোহব্যক্তঃ" (সূক্ষ্ম ও অপ্রকাশিত) ধারণার হুবহু অনুবাদ।
সনাতন ব্রহ্ম: বৌদ্ধধর্মে কোনো চিরস্থায়ী 'সনাতন' সত্তা নেই। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে "একব্রহ্ম সনাতন" বলা হয়েছে, যা বৈদিক উপনিষদ ও মনুস্মৃতির মূল কথা।

উপসংহার: এই পাঠগুলো 'শূন্য' শব্দটিকে বৌদ্ধ অর্থে নয়, বরং বৈদিক 'নাসদীয় সূক্তে' বর্ণিত সেই আদি-অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করেছে যেখানে পরম ঈশ্বর একাকী বিরাজ করতেন। এটি "Void with God", যা বৌদ্ধধর্মে অসম্ভব। এখন প্রশ্ন—ধর্মঠাকুর প্রকৃতপক্ষে কে? তিনি কি বিষ্ণু, শিব, সূর্য, নাকি মনুস্মৃতিতে উল্লেখিত ভিন্ন এক দেবতা?
এখানেই মনে পড়ে মহারাজ মনুর সেই উক্তি—ধর্মের বহু মত রয়েছে, আর শ্রেষ্ঠ হলো আপনার মাতা-পিতা যে ধর্ম অনুসরণ করেন; অর্থাৎ কুলধর্ম। জাতি ও কুল অনুযায়ী আপনার পূর্বপুরুষ যা মান্য করেছেন, তাই আপনার ধর্ম।



সরস্বতী পূজা: ধর্মতত্ত্বের আড়ালে আধুনিক বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব

শুভশ্রী চক্রবর্তী

(১) মা সরস্বতী কেন শুভ্রতার প্রতীক?

শুধু রং নয়, এটা এক গভীর দর্শন। মা সরস্বতীকে আমরা দেখি সম্পূর্ণ শুভ্র– শুভ্র বসন, শুভ্র গাত্রবর্ণ, শুভ্র আভা। কেন? কারণ, শুভ্রতা মানে শূন্যতা। যেখানে কোনও রাগ নেই, লোভ নেই, কাম নেই, হিংসা নেই। শুভ্র মানে নির্লিপ্ততা। যে জ্ঞান কোনও পক্ষ নেয় না, কোনও স্বার্থ দেখে না। মা সরস্বতীর শুভ্র রং বলে– জ্ঞান নিরপেক্ষ। সে কাউকে ছোট করে না, কাউকে বড় করে না। সে শুধু আলোক দেয়। শুভ্র রং আরেকটা কথা শেখায়– যেমন কাগজ সাদা না হলে লেখা স্পষ্ট হয় না, তেমনি মন সাদা না হলে জ্ঞান স্থিত হয় না। আমরা অনেক পড়ি, অনেক জানি, কিন্তু মন যদি ঈর্ষা, অহংকার আর বিদ্বেষে ভরা থাকে– তাহলে সেই জ্ঞান আলো নয়, অন্ধকার হয়ে যায়। দেবী সরস্বতীর শুভ্রতা তাই বলে– "আগে মন নির্মল করো, তারপর জ্ঞান আপনিই ধরা দেবে।" এজন্যই বিদ্যার দেবীকে কখনও রঙিন পোশাকে দেখানো হয় না। কারণ সত্যিকারের জ্ঞান বাহ্যিক জৌলুস নয়, অন্তরের প্রভা।

(২) শ্বেত বসন– জ্ঞান কেন কখনও রঙিন নয়?

মা সরস্বতী শ্বেত বসন পরিধান করেন। এই শ্বেত বসন কোনও সাজ নয়– এটা এক গভীর জীবনদর্শন। রঙিন পোশাক মানে আকর্ষণ, আবেগ, মোহ। রঙ মানে পক্ষপাত। রং মানে "আমি আলাদা, আমাকে দেখো।" কিন্তু জ্ঞান কখনও চায় না নজর কাড়তে। জ্ঞান নীরবে আলো দেয়। নিজেকে জাহির করে না। এই জন্যই বিদ্যার দেবীর পোশাক শ্বেতশুভ্র– কারণ সত্যিকারের জ্ঞান নির্লিপ্ত। সে কারও পক্ষে নয়, কারও বিপক্ষে নয়। সে শুধু সত্যের পক্ষে। শ্বেত বসন আরও বলে– যে মানুষ জ্ঞানী, তার ভেতরে বেশি রং থাকে না; না অহংকারের লাল, না হিংসার সবুজ, না লোভের সোনালি। তার মন সাদা, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ। আমরা আজ রঙিন পোশাকে জ্ঞান খুঁজি– ডিগ্রি, পদ, খ্যাতি, ফলোয়ার। কিন্তু মা সরস্বতী বলেন– "জ্ঞান মানে প্রদর্শন নয়, জ্ঞান মানে পরিশুদ্ধতা।" এই জন্যই বিদ্যার দেবী রঙিন নন। কারণ সত্যিকারের আলো কখনও রঙিন হয় না। সে শুধু আলোকিত করে।

(৩) দেবী সরস্বতীর বীণা শুধু এক বাদ্যযন্ত্র নয়:
এটা মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের প্রতীক। বীণার তার যেমন টানটান না হলে সুর হয় না, আবার বেশি টান দিলে ছিঁড়ে যায়– ঠিক তেমনই মানুষের স্নায়ুও। খুব ঢিলা হলে মানুষ অলস হয়, খুব টানটান হলে মানুষ ভেঙে পড়ে। সঠিক টানেই জন্ম নেয় সুর। সঠিক ভারসাম্যেই জন্ম নেয় শান্তি। বীণার প্রতিটি তার আমাদের ভেতরের এক-একটি স্নায়ু পথ। যেখান দিয়ে অনুভূতি, চিন্তা, যন্ত্রণা, আনন্দ সব বয়ে যায়। দেবী সরস্বতী তাই বীণা হাতে কারণ, তিনি শেখান জীবনের সুর কীভাবে ঠিক রাখতে হয়। যে মানুষ রাগে, দুশ্চিন্তায়, ঈর্ষায় ভরে যায়– তার স্নায়ু সুর হারায়। তার মন অশান্ত হয়। মা সরস্বতী বলেন, "নিজেকে অতিরিক্ত প্রসারিত কোরো না, আবার একেবারে ছেড়েও দিও না।" জীবন মানে নিখুঁত সুর নয়, জীবন মানে যথাযথ সুরে বাঁধা বীণার সুর।
(৪) পদ্মাসনে বসা– মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের যোগ:
মা সরস্বতীকে আমরা দেখি পদ্মাসনে আসীন। এটা শুধু ধ্যানের ভঙ্গি নয়, এটা মানুষের শরীর ও চেতনার মানচিত্র। পদ্মাসনে মেরুদণ্ড সোজা থাকে। সোজা মেরুদণ্ড মানে, মস্তিষ্কে শক্তির প্রবাহ বাধাহীন। যোগশাস্ত্র বলে, মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়েই জ্ঞানশক্তি ঊর্ধ্বগামী হয়। এই জন্যই ধ্যান, জপ, পড়াশোনা– সব সময় বসে সোজা হয়ে করতে বলা হয়। মা সরস্বতী'র পদ্মাসন বলে– জ্ঞান আসে অস্থির দেহে নয়, স্থির দেহে। পদ্মাসন আরও বলে– যেমন পদ্ম কাদা থেকে উঠে নির্মল থাকে, তেমনি মানুষ সংসারের কোলাহল থেকে উঠে শুদ্ধ চেতনা অর্জন করতে পারে। আমরা আজকাল শুয়ে শুয়ে, মোবাইল হাতে, মাথা নীচু করে পড়াশোনা করি। ফল কী হয়? মন ঘোরে, মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়, জ্ঞান অন্তরে প্রবেশ করে না। মা সরস্বতী বলেন– "দেহ সোজা রাখো, চিন্তা সোজা হবে।"
(৫) হংস বাহন– বিবেক কীভাবে দুধ আর জল আলাদা করে:
মা সরস্বতীর বাহন হংস। কাক, সিংহ বা হাতি নয়– হংস। কেন? কারণ হংসের একটি প্রতীকী ক্ষমতা আছে– সে দুধ আর জল আলাদা করতে পারে(আক্ষরিক নয়, দার্শনিক অর্থে)। হংস মানে বিবেক। ভাল আর মন্দ আলাদা করার শক্তি। সত্য আর মিথ্যা আলাদা করার বুদ্ধি। প্রয়োজন আর লোভ আলাদা করার বোধ। এই জন্যই বিদ্যার দেবীর বাহন হংস। কারণ জ্ঞান মানে সব কিছু জেনে ফেলা নয়– জ্ঞান মানে কী নেবে আর কী ছাড়বে তা বুঝে ফেলা। আমরা আজ সব গ্রহণ করি– ভাল কথাও, খারাপ কথাও। সুন্দর চিন্তাও, বিষাক্ত চিন্তাও। ফল কী হয়? মন ভারী হয়। বুদ্ধি ঘোলাটে হয়। জীবনের দিশা হারায়। মা সরস্বতী বলেন– "সব কিছু আত্মস্থ কোরো না। বিবেক দিয়ে বেছে নাও।" যে মানুষ হংসের মতো বাঁচে– সে জগৎ থেকে বিষ নয়, মধু তুলে নেয়।
(৬) অক্ষমালা–জ্ঞান অর্জনের ধাপ:
দেবী সরস্বতীর হাতে যে অক্ষমালা, তা শুধু জপের মালা নয়– তা মানুষের শেখার যাত্রাপথ। অক্ষমালার প্রতিটি মণি এক-একটি ধাপ। ভুল, চেষ্টা, ব্যর্থতা, ধৈর্য, উপলব্ধি। জ্ঞান কখনও এক দিনে আসে না। একটি মণি ছুঁয়ে আরেকটা মণিতে যেতে হয়। আমরা আজ ফল চাই তাড়াতাড়ি। ডিগ্রি চাই, নাম চাই, খ্যাতি চাই। কিন্তু ধৈর্য চাই না। অক্ষমালা তাই শেখায়– ধীরে চলা মানেই পিছিয়ে পড়া নয়। ধীরে চলা মানেই গভীরে যাওয়া। একটি মণি ছিঁড়ে গেলে মালা অসম্পূর্ণ হয়। একটি ভুল শুধরে না নিলে মানুষ অসম্পূর্ণই হয়। মা সরস্বতী বলেন, "ভুল করো, কিন্তু থেমে যেও না।" জ্ঞান মানে নিখুঁত হওয়া নয়, জ্ঞান মানে এগিয়ে চলা।
(৭) বসন্ত পঞ্চমীতেই কেন সরস্বতী পূজা?
কেন অন্য কোনও দিনে নয়– শুধু বসন্ত পঞ্চমীতেই? কারণ বসন্ত মানেই নতুন জন্ম। নতুন কুঁড়ি, নতুন পাতা, নতুন রোদ। প্রকৃতি নিজেই তখন শেখায়– "আবার শুরু করো।" ঠিক এই সময়েই বিদ্যার দেবীর আরাধনা। কারণ জ্ঞানও নতুন শুরু চায়। শীতের শেষে মানুষ অলস হয়, মন ভারী হয়, চিন্তায় ঝিমিয়ে পড়ে। বসন্ত এসে বলে, "ঘুম ভাঙাও। মন জাগাও। বুদ্ধি জাগাও।" এই জন্যই বসন্ত পঞ্চমী। কারণ জ্ঞান আসে জাগ্রত মনে। আরেকটি গভীর কথা আছে। সরস্বতী মানে প্রবাহ। জ্ঞান মানে চলমান নদী। বসন্তে যেমন বরফ গলে জল নামে, তেমনি মানুষের ভেতরের জ্ঞানশক্তি এই সময়ে সক্রিয় হয়। মা সরস্বতী তাই এই দিনেই আসেন। তিনি বলেন– "প্রকৃতি যখন শিখতে শুরু করেছে, তুমি কেন পিছিয়ে থাকবে?"

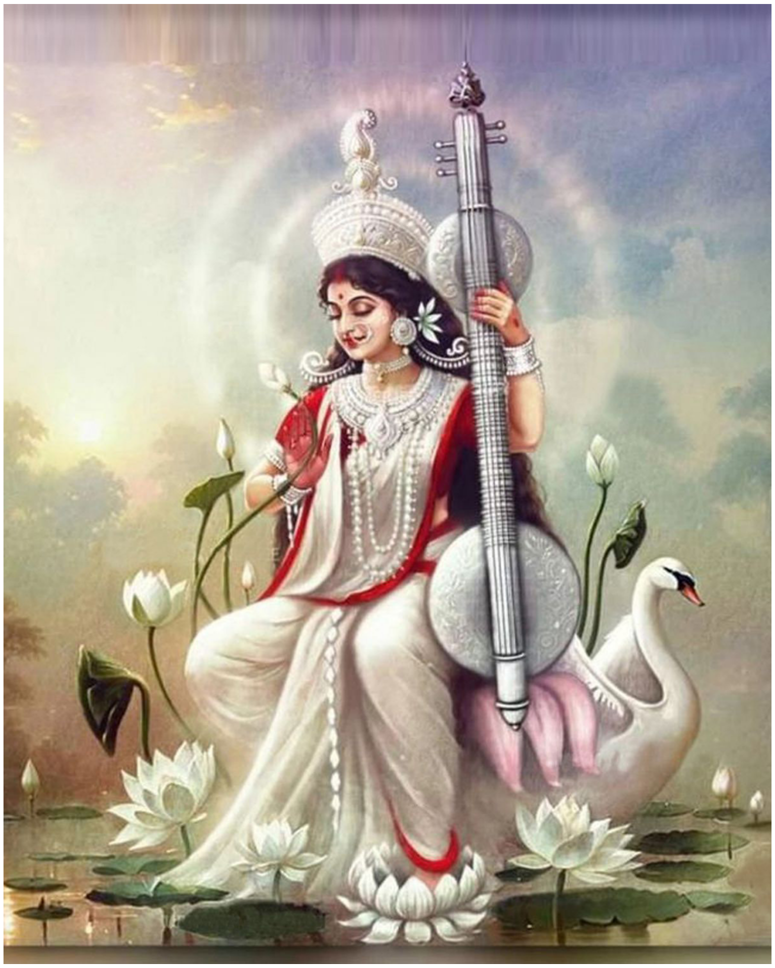
(৮) বসন্ত ঋতু ও মানব মস্তিষ্কের সম্পর্ক:
বসন্ত আসলেই মানুষের মন বদলে যায়। কেন? কারণ প্রকৃতি শুধু বাইরে নয়, আমাদের ভেতরেও ঋতু বদলায়। শীতের সময় শরীর ঝিমিয়ে থাকে। রক্ত সঞ্চালন ধীর হয়। মস্তিষ্কে অক্সিজেন কম পৌঁছায়। ফল কী? মনোযোগ কমে। ইচ্ছাশক্তি কমে। আনন্দবোধ কমে। বসন্তে রোদ বাড়ে। হাওয়া নরম হয়। শরীর জেগে ওঠে। মস্তিষ্কে তখন সেরোটোনিন বাড়ে– যাকে বলে "হ্যাপি হরমোন।" ফল কী হয়? মন হালকা হয়। মনে শেখার আগ্রহ জন্মায়। স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। এই জন্যই প্রাচীন ঋষিরা এই সময়েই বিদ্যার আরাধনা রেখেছিলেন। কারণ, জ্ঞান আসে সুখী মস্তিষ্কে, অবসন্ন মস্তিষ্কে নয়। মা সরস্বতী তাই বসন্তেই পূজিত হন। মা যেন বলেন, "প্রকৃতির সাথে তাল মেলাও। শেখা তখন সহজ হবে।"

(৯) প্রকৃতির সাথে শিক্ষার মেলবন্ধন:
বসন্ত পঞ্চমীর সকালে আকাশ আলাদা লাগে। রোদ নরম হয়। হাওয়া মিষ্টি হয়। প্রকৃতি যেন ফিসফিস করে বলে–"আজ শেখো।" কেন? কারণ প্রকৃতি নিজেই তখন পাঠদান করে। শুকনো ডালে কুঁড়ি ফোটে। মরা পাতার ভেতর থেকে নতুন পাতা আসে। মাটি ভেঙে অঙ্কুর বেরোয়। এই সবকিছু একটাই কথা শেখায়– শেষ মানেই শেষ নয়। আবার শুরু হয়। মানুষও ঠিক তাই। তোমার ব্যর্থতা, তোমার হতাশা, তোমার থেমে যাওয়া– সব কিছুর পরেও নতুন করে শেখা যায়। এই দিনটা তাই বিদ্যার দেবীর। কারণ জ্ঞান মানে শুধু বই মুখস্থ নয়– জ্ঞান মানে বারবার উঠে দাঁড়ানো। মা যেন বলেন– "প্রকৃতির দিকে তাকাও। সে হাল ছাড়ে না। তুমিও ছেড়ো না।" এই জন্যই বসন্ত পঞ্চমী শেখার উৎসব।

(১০) ঋতু ও চেতনার স্তর:
হিন্দু দর্শনে ঋতু শুধু আবহাওয়া নয়– ঋতু মানে চেতনার স্তর। গ্রীষ্ম মানে তেজ। বর্ষা মানে প্রবাহ। শরৎ মানে পরিপক্কতা। হেমন্ত মানে সংগ্রহ। শীত মানে স্থবিরতা। বসন্ত মানে জাগরণ। তাহলে প্রশ্ন আসে– সরস্বতীর স্থান কেন বসন্তে? কারণ, সরস্বতী মানে জাগ্রত বুদ্ধি। যে বুদ্ধি ঘুমিয়ে থাকলে আসে না। শীতের সময় মানুষ নিজের মধ্যে ঢুকে যায়। মন ভারী হয়। চিন্তায় ঝিমিয়ে পড়ে। বসন্ত এসে সেই ঘুম ভাঙায়। এই জন্যই ঋতুচক্রে সরস্বতীর স্থান বসন্তে। মা যেন বলেন– "তুমি যখন জেগে উঠবে, আমি তখন আসব।" জ্ঞান মানে সারা বছর পড়া নয়– জ্ঞান মানে সঠিক সময়ে জাগা। সরস্বতী পূজা কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়– এটি প্রকৃতি, সময় ও মানুষের মনের এক গভীর মিলন। এই পূজা কেন বসন্ত পঞ্চমীতেই হয়, তার পিছনে আছে বিজ্ঞান, দর্শন ও আবেগের এক সুন্দর সমন্বয়।

(১১) হলুদ রঙের বিজ্ঞান:
হলুদ শুধু একটা রং নয়– হলুদ আসলে মস্তিষ্কের ভাষা। যখন আমরা হলুদ রং দেখি, আমাদের মস্তিষ্কে কিছু সুক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞান কী বলে? হলুদ রং মানুষের চোখে পড়লেই ব্রেনের ভিজ্যুয়াল কর্টেক্স সক্রিয় হয়, আর সেখান থেকে সিগন্যাল যায় লিম্বিক সিস্টেমে– যেটা আবেগ আর শেখার কেন্দ্র। ফল কী হয়?
১. সেরোটোনিন বাড়ে (মন ভালো থাকে, হতাশা কমে, শেখার আগ্রহ বাড়ে)।
২. ডোপামিন ব্যালেন্স হয় (অতিরিক্ত উত্তেজনা কমে, মন স্থির হয়, মনোযোগ বাড়ে)।
৩. রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম (RAS) জাগে (ব্রেন "অ্যালার্ট মোডে" যায়, তন্দ্রাভাব কাটে, ফোকাস বাড়ে)।
একারণেই, পরীক্ষার পূর্বে হালকা হলুদ আলো বা দেয়াল মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। আধ্যাত্মিক দিক থেকে হলুদ হলো জাগরণের রং। সূর্যের রং। জ্ঞানের আলোর রং। দেবী সরস্বতীর পূজায় হলুদ মানে– মনকে অলসতা থেকে জাগিয়ে তোলা। হলুদ রং যেন নির্দেশ দেয়– "ঘুম ভাঙাও। শেখা শুরু করো।"

(১২) পঞ্চমী ও উৎসবের সাজ:
বসন্ত মানেই হলুদ। সরিষা ফুল, গাঁদা, রোদ্দুর–সবকিছুই যেন সোনালি। হলুদ রং মানে উষ্ণতা, শক্তি, আশা। এটি বিষণ্ণতা দূর করে, মনে সাহস জাগায়। তাই এই দিনে হলুদ পোশাক, হলুদ ফুল, হলুদ ভোগ–সবই বলে যে জ্ঞান মানে আলোর পথে হাঁটা। ভারতীয় দর্শনে 'পাঁচ' সংখ্যাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচ ইন্দ্রিয়, পাঁচ তত্ত্ব, পাঁচ প্রাণ। পঞ্চমী মানে– ইন্দ্রিয় ও মনকে শুদ্ধ করে জ্ঞানের পথে যাত্রা। এই তিথি মনে করিয়ে দেয়– বিদ্যা শুধু বইয়ে নয়, জীবনের পাঁচ দরজা দিয়ে আসে। ঋতু বদলালে মানুষের মনও বদলায়। শীতের মন ভারী



থাকে, বসন্তে মন হালকা হয়। এই সময় মানুষ প্রেমে পড়ে, কবিতা লেখে, গান গায়, নতুন স্বপ্ন দেখে। তাই বিদ্যার আরাধনা এই সময়েই সবচেয়ে ফলপ্রসূ। কারণ মন উন্মুক্ত থাকলেই জ্ঞান মনে স্থিত হয় । সরস্বতী পূজা নতুন শুরুর প্রতীক।

(১৩) কুল খাওয়ার বারণ - দর্শন ও বিজ্ঞান:

আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি সরস্বতী পুজোর আগে কুল খাওয়া বারণ। কেন? এটা কি শুধু কুসংস্কার? নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে গভীর দর্শন আর বাস্তব বিজ্ঞান? দর্শনের দিক থেকে কুল কামনা ও ইন্দ্রিয়লোভের প্রতীক। দেবী সরস্বতী শেখান– জ্ঞান মানে শুধু পড়া নয়, জ্ঞান মানে সংযম। যে মানুষ নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে নিজের মনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে? এই জন্যই কুল খাওয়া বারণ। বিজ্ঞান বলে কুল খুব মিষ্টি ও কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ ফল। খালি পেটে বা সকালে এটা খেলে–

১. রক্তে শর্করা হঠাৎ বেড়ে যায়, ইনসুলিন দ্রুত নিঃসৃত হয়, এরপর হঠাৎ শর্করা নেমে যায়, মাথা ঝিমিয়ে পড়ে, মনোযোগ কমে।

২. অ্যাসিডিক রিঅ্যাকশন হয় (গ্যাস, অ্যাসিডিটি, পেট ভার)।

৩. ডোপামিন স্পাইক হয়–মন আনন্দ খোঁজে, শান্তি খোঁজে না।

বসন্তে, শরীরের মেটাবলিজম এমনিতেই দ্রুত হয়। এই সময় অতিরিক্ত মিষ্টি ফল শরীরকে আরও উত্তেজিত করে। আসল শিক্ষা কী? নিষেধ মানে ভয় নয়। নিষেধ মানে বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলা।

(১৪) উপবাসের গুরুত্ব:

সরস্বতী পূজার দিনে বাড়িতে প্রায়ই বলা হয়–"আজ ভারী খাবার নয়। হালকা খাও। উপবাস থাকলে ভালো।" আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ - খাবার মানেই শক্তি, ইচ্ছা, কামনা, ঘুম, অলসতা। ভারী খাবার শরীরকে টানে নিচের দিকে। মা সরস্বতীর সামনে উপবাস মানে "আমি আজ দেহের নয়, বুদ্ধির কথা শুনব।" বিজ্ঞান কী বলে?

১. উপবাসে কী হয় শরীরে? উপবাস করলে শরীরে শুরু হয়–
Autophagy। শরীর নিজেই নিজের নষ্ট কোষ পরিষ্কার করে।

২. উপবাস ও মস্তিষ্ক: উপবাসে বাড়ে BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor)। এই হরমোন স্মৃতি, মনোযোগ ও শেখার ক্ষমতা বাড়ায়। মানে উপবাস = মস্তিষ্কের রিফ্রেশ বাটন। ভারী খাবার বাড়ায় তামসিক গুণ (অলসতা, জড়তা, ঘুম)। উপবাস বাড়ায় সাত্ত্বিক গুণ (শান্তি, স্বচ্ছতা, বুদ্ধি)।

(১৫) মৌনতা ও শব্দসংযম:

বাড়ির বড়রা বলেন– "আজ বেশি কথা বলিস না।" আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি: শব্দ মানেই শক্তি। যে মুখ দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ হয়, সেই মুখ দিয়ে যদি রাগ, অশ্রাব্য কথা, মিথ্যে, নিন্দা বের হয় তাহলে পূজার শক্তি নষ্ট হয়। বিজ্ঞান কী বলে?

১. বেশি কথা বললে কর্টিসল (Stress Hormone) বাড়ে, মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়।

২. নীরবতা বাড়ায় Grey Matter, নিউরনের সংযোগ, ফোকাস ও ক্রিয়েটিভিটি। গবেষণায় দেখা গেছে– দিনে

মাত্র দুই ঘণ্টা নীরবতা মস্তিষ্কের নতুন কোষ তৈরি বাড়ায়।
৩. কথা ও ব্রেন কেমিস্ট্রি– রাগের কথা বললে অ্যাড্রেনালিন বাড়ে, শান্ত কথা বললে ডোপামিন, সেরোটোনিন ও অক্সিটোসিন বাড়ে। আয়ুর্বেদে বলা হয়– অতিরিক্ত কথা বাড়ায় রাজসিক গুণ, মৌনতা বাড়ায় সাত্ত্বিক গুণ।

(১৬) বই-খাতা পূজা ও বিরতি:

কলম, খাতা, বই, বাদ্যযন্ত্র মা'র পায়ের কাছে রাখা হয়। আর সেদিন বই খুলে পড়া যায় না। কেন? আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি - কলম-খাতা পায়ে দেওয়া মানে নম্রতা, শরণ নেওয়া, অহংকার ভাঙা। আমরা আসলে বলি, "এই বিদ্যা আমার নয়, এই জ্ঞান তোমার দান।" বই খুলে না পড়া মানে পূজার দিন বিদ্যার ব্যবহার নয়, বিদ্যার উৎসের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বিজ্ঞান কী বলে?
১. অহংকার ও শেখার ক্ষমতা: যারা ভাবে "আমি সব জানি" – তাদের ব্রেনে নতুন নিউরাল কানেকশন কম তৈরি হয়।
২. বিরতি (Break) কেন জরুরি? একদিন না পড়লে মেমোরি কনসলিডেশন হয়, ব্রেন রিফ্রেশ হয়, বার্নআউট কমে।
৩. কৃতজ্ঞতা ও ব্রেন কেমিস্ট্রি: কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে বাড়ে ডোপামিন ও সেরোটোনিন। মানে মা'কে ধন্যবাদ দেওয়াই ব্রেনকে আপগ্রেড করা।

(১৭) প্রসাদ হিসেবে খিচুড়ি কেন?

১. আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি: খিচুড়ি মানেই হলো সরলতা, সমতা, মিশ্রণ এবং সংযম। চাল, ডাল এবং সবজি যখন এক পাত্রে মিশে একাকার হয়ে যায়, তখন সেখানে কোনো আলাদা অহংকার থাকে না। এটাই বিদ্যার আসল দর্শন সব মানুষ সমান, সব জ্ঞান এক।
২. বিজ্ঞানের চোখে খিচুড়ি: খিচুড়িতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন এবং মিনারেলস সব উপাদানই এক পাত্রে পাওয়া যায়। এটি অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং সহজে হজম হয়। এটি মস্তিষ্কে স্থির শক্তি সরবরাহ করে।
৩. আয়ুর্বেদ কী বলে? আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে খিচুড়িকে বলা হয় 'ত্রিদোষনাশক'। এটি সাত্ত্বিক আহার, রোগীর খাদ্য, যোগীদের খাদ্য। মা সরস্বতীর প্রসাদ রাজভোগ নয়, খিচুড়ি কারণ বিদ্যা আসে বিলাসে নয়, ভারসাম্যে।

(১৮) রীতির আড়ালে লুকিয়ে থাকা রহস্য:

সরস্বতী পূজা শুধু ফুল, ধূপ, প্রসাদ নয়। প্রতিটা নিয়মের পিছনে আছে শৃঙ্খলা, মনোবিজ্ঞান আর এক গভীর জীবনদর্শন।
১. দোয়াত-খাগ: এটা দ্বারা হাতে লেখা, মস্তিষ্ককে আরও শক্ত করে।
২. পলাশ ফুল: রক্তিম রঙ অলসতা পোড়ায়।
৩. ময়ূরের পালক: বিষনাশক প্রতীক, অজ্ঞতা দূর করে।
৪. হাতে খড়ি: জীবন শেখার প্রথম ধাপ।
৫. যব: শরীর সুস্থ মানেই মন প্রস্তুত।
৬. তেল-হলুদ-নিম স্নান: ডার্মাটোলজি ও মাইক্রোবায়োলজির মিশেল। শীতের পরে বসন্তে সংক্রমণ বাড়ে, তাই নিম ও হলুদ প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে কাজ করে।

এই পূজা আমাদের শেখায়–শৃঙ্খলা মানেই ধর্ম। শুদ্ধতা মানেই শক্তি। আর বিদ্যা মানেই ভারসাম্য। এটা এক প্রাচীন এডুকেশন সিস্টেম। যেখানে রীতি আছে, কিন্তু তার ভেতরে লুকিয়ে আছে বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব আর জীবনদর্শন।



বিশ্বকাপ ও আমাদের লক্ষ্যভেদ(গোল)

নিরঞ্জন চন্দ্র দাশ

কিছুদিন পরেই শুরু হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। ৪৮ -দলের মহারণ শুরু হবে। সবার লক্ষ্য একটাই,বিশ্বকাপ ট্রফির দিকে একটু একটু করে এগিয়ে চলা। সবার একটাই স্বপ্ন একটি গোল করা এবং বিশ্বকাপ ছুঁয়ে দেখা। মনে হতে পারে যেখানে ওরা কোটি কোটি টাকা ইনকাম করে সেখানে বিশ্বকাপ ছুঁয়ে দেখার স্বপ্ন এমন আর কি? কিন্তু, এটাকে কেবল স্বপ্ন বললে ভুল হবে এটাই একজন খেলোয়াড়ের একমাত্র লক্ষ্যভেদ।
এটি পাওয়া হলে সেখানে কোটি কোটি টাকার কোন মূল্য থাকেনা কিন্তু অধরা রয়ে গেলে কোটি কোটি টাকাও তুচ্ছ মনে হয়। ২০২২ সালে মেসি যখন বিশ্বকাপ ছুঁয়ে দেখেছিল যেন সে একজন শিশুর মতন হয়ে গেছে আনন্দে যেমনটা একজন শিশু মায়ের কোল পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় তেমনিই মেসিও।
মেসির জীবনে ফুটবলের সবকিছু ছিল,যার সাপ্তাহিক আয় ছিল ৭কোটি ৩০ লাখ কিন্তু ছিল না একটি বিশ্বকাপ জয়। অনেকবার অভিমান করে অবসরও নিয়েছিলেন। অনেক অপেক্ষার পর অবশেষে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে যা একটি খেলোয়াড়ের একমাত্র লক্ষ্য হয়।
আচ্ছা এ তো গেল একজন খেলোয়াড়ের স্বপ্ন; আচ্ছা, আমাদের মানব জীবনের লক্ষ্য (গোল) কি ভেবেছেন কখনো? প্রশ্নটা মানানসই লাগছেনা তাই না! জীবনের লক্ষ্য আর কী? খাও দাও ফুর্তি করো এবং একদিন বিদায় নিয়ে চলে যাওয়া, ব্যস এটাই জীবন। কিন্তু, এটা ভুল ধারণা,এই পৃথিবীটাও একটা মাঠ আমরা প্রত্যেকেই হচ্ছি একেকজন খেলোয়াড় আর সবাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ। আচ্ছা মাঠ তো খুঁজে পেলাম কিন্তু আমরা কোথায় লক্ষ্যভেদ (গোল) করবো সেটাতো জানিনা।
সনাতন বা হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের জীবনের লক্ষ্যকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যাকে একত্রে 'পুরুষার্থ' বলা হয়। এই চারটি স্তম্ভই একজন মানুষের জীবনকে সার্থক করে তুলে। জীবনের সেই চারটি মূল লক্ষ্য(গোল) বা পুরুষার্থ নিয়ে আলোচনা করা যাক -
১) ধর্ম: এটি জীবনের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এখানে 'ধর্ম' মানে কেবল পূজা-পার্বণ নয়, বরং কর্তব্য, নীতি এবং সদগুণ পালন করা। নিজের পরিবার, সমাজ এবং প্রকৃতির প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করাই

ধর্ম। অন্যায়ের পথ ত্যাগ করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলাই হলো ধর্মের মূল লক্ষ্য।
২) অর্থ: জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সার্থকতা অর্জন করা। শাস্ত্র মতে, সৎ পথে অর্থ উপার্জন করা অপরাধ নয়, বরং প্রয়োজন। পরিবার প্রতিপালন এবং সামাজিক কল্যাণের জন্য জাগতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা কর্তব্য। তবে মনে রাখতে হবে, অর্থ অর্জনের উপায় যেন অবশ্যই 'ধর্ম' বা নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়।
৩) কাম: এটি হলো জীবনের ইচ্ছা, আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তি। সুন্দর শিল্পকলা, প্রেম, এবং জীবনের স্বাভাবিক আনন্দগুলো উপভোগ করাও শাস্ত্রসম্মত। মানুষের আবেগীয় এবং শারীরিক চাহিদার ভারসাম্যপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ধর্মের সীমার মধ্যে থেকে কামনা বা ইচ্ছা পূরণ করা উচিত।
৪) মোক্ষ: এটিই জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। মোক্ষ মানে হলো জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি এবং পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলন। জাগতিক মায়া এবং মোহ থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করা। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান বা কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভই হলো মোক্ষ।

জীবনের পর্যায়: বর্ণাশ্রম ধর্ম
এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য মানুষের জীবনকে চারটি স্তরে (আশ্রম) ভাগ করা হয়েছে -
ব্রহ্মচর্য: শিক্ষা গ্রহণ এবং আত্মসংযমের সময়।
গার্হস্থ্য: বিবাহিত জীবন, সন্তান লালন-পালন এবং অর্থ উপার্জন (ধর্ম, অর্থ ও কাম পালনের সময়)।
বানপ্রস্থ: ধীরে ধীরে জাগতিক মায়া ত্যাগ করে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়া।
সন্ন্যাস: সর্বস্ব ত্যাগ করে কেবল মোক্ষ লাভের সাধনায় মগ্ন হওয়া।
ধর্ম আমাদের শেখায় যে জীবন মানে কেবল ত্যাগ নয়, আবার কেবল ভোগও নয়। এটি হলো কর্তব্য (ধর্ম), সমৃদ্ধি (অর্থ) এবং আনন্দের (কাম) এক সুসমন্বয়, যার শেষ গন্তব্য হলো মুক্তি বা মোক্ষ(গোল)।
উপনিষদে মুক্তির (মোক্ষ) পথ এবং স্বরূপ নিয়ে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে -
যা আত্মজ্ঞান এবং পরমাত্মার সাথে মিলনের কথা বলে:
১. অমৃতত্ত্বের প্রার্থনা (বৃহদারণ্যক উপনিষদ)
এটি উপনিষদের সবচেয়ে বিখ্যাত শ্লোকগুলোর একটি, যেখানে মানুষের মরণশীল অবস্থা থেকে অমরত্ব বা মুক্তির প্রার্থনা করা হয়েছে।

অসতো মা সদ্গময়।
(অসৎ থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও।)
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
(অন্ধকার থেকে আমাকে আলোতে নিয়ে যাও।)
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়॥
(মৃত্যু থেকে আমাকে অমরত্বে বা মুক্তিতে নিয়ে যাও।)
(শুক্ল যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১.৩.২৮)

২. আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি (কঠ উপনিষদ)
কঠ উপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে জীবনের পরম লক্ষ্য এবং মুক্তি সম্পর্কে বলেছেন যে, ইন্দ্রিয় ও মনের ঊর্ধ্বে গিয়ে আত্মাকে জানাই হলো মুক্তি।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতাদুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎকবয়ো বদন্তি॥
(কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠ উপনিষদ — ১.৩.১৪)

অর্থ: ওঠো, জাগো, মহৎ ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে জ্ঞান লাভ করো। কারণ মুক্তির পথ ক্ষুরধারের মতো তীক্ষ্ণ এবং দুর্গম—এমনটাই জ্ঞানীরা বলে থাকেন।

৩. পরম সত্যের প্রকাশ (মুণ্ডক উপনিষদ)

এই শ্লোকটি ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ বাক্য হিসেবেও পরিচিত, যা সত্যের মাধ্যমে মুক্তির কথা বলে।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।

(অথর্ববেদীয় মুণ্ডক উপনিষদ — ৩.১.৬)

অর্থ: সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়। সত্যের মাধ্যমেই মোক্ষ বা দেবযানের (মুক্তির পথ) বিস্তার ঘটে।

৪. অদ্বৈত জ্ঞান বা অভেদ দর্শন (ঈশোপনিষদ)

যখন মানুষ বুঝতে পারে যে সবকিছুর মধ্যে এক পরমাত্মা বিদ্যমান, তখন তার মোহ বা শোক থাকে না—এটিই মুক্তির অবস্থা।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

(শুক্ল যজুর্বেদীয় ঈশোপনিষদ — ৭)

অর্থ: যখন জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত জীবের মধ্যে নিজের আত্মাকে এবং নিজের আত্মার মধ্যে সমস্ত জীবকে অনুভব করেন, তখন সেই একত্ব দর্শনের ফলে তাঁর আর কোনো মোহ বা শোক থাকে না।

৫. ব্রহ্মজ্ঞান (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ)

এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে অন্ধকার বা অজ্ঞানতার ওপারে থাকা সেই 'আদিত্যবর্ণ' পরম পুরুষকে জানলেই মৃত্যুকে জয় করা সম্ভব।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

(কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ — ৩.৮)

অর্থ: আমি সেই মহান পুরুষকে জানি যিনি অন্ধকারের অতীত এবং সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়। তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় (মুক্তি লাভ হয়), এর বাইরে অন্য কোনো পথ নেই।

উপনিষদ অনুসারে, মুক্তি কোনো সাধারণ বিষয় নয়। এটি হলো নিজের ভেতরকার 'অজ্ঞানতা' দূর করে 'আত্মজ্ঞান' লাভ করা। যখন মানুষ বুঝতে পারে যে সে শরীর বা মন নয়, বরং শুদ্ধ আত্মা—তখনই সে মুক্ত। উপনিষদ অনুসারে এটাই হচ্ছে আমাদের মানব জীবনের লক্ষ্যভেদ(গোল)!

সর্বমাত্মনি সংপশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ।
সর্বং হ্যাত্মনি সংপশ্যন্ ধর্মতো ন বিচলিত।।

(মনুস্মৃতি, ১২.১১৮)

অর্থ: মানুষ যেন স্থির চিত্তে সৎ এবং অসৎ সবকিছুই নিজের আত্মার মধ্যে দর্শন করে। যিনি সবকিছুকে নিজের আত্মার মধ্যে দেখেন, তিনি অধর্মের পথে পরিচালিত হন না।

- **আত্মজ্ঞান ও মোক্ষ (মনু:১২.১২৫)**

এটি মনুস্মৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শ্লোক, যা উপনিষদের দর্শনের সাথে মিলে যায়।

এবং যঃ সর্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্।।

সরলার্থ: এইভাবে যিনি সর্বভূতে ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে নিজের থেকে অভিন্নরূপে দেখেন, তিনি সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হ'য়ে সনাতন অর্থাৎ পরমপদ ব্রহ্মভাব লাভ করেন।

- **কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি (মনু:১২.৮৮)**

এখানে মোক্ষ লাভের জন্য কোন ধরনের কর্ম করা উচিত, তা বলা হয়েছে।

সুখভ্যুদয়িকং চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ।
প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ দ্বিবধং কর্ম বৈদিকম্॥

সরলার্থ: বৈদিক কর্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্ম জাগতিক সুখ ও ঐশ্বর্য দেয় (যা পুনর্জন্ম ঘটায়),

কিন্তু নিবৃত্ত কর্ম (নিষ্কাম কর্ম) মানুষকে পরম কল্যাণ বা মোক্ষ দান করে।

• মোক্ষ লাভের প্রধান সাধন (মনু:১২.৮৩)

এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে শাস্ত্রীয় আচার পালনের চেয়েও জ্ঞানের গুরুত্ব কতখানি।

বেদভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাং চ সংজমঃ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।।

সরলার্থ: বেদাভ্যাস (শাস্ত্র চর্চা), তপস্যা, তত্ত্বজ্ঞান, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা এবং গুরুসেবা—এই ছয়টি কাজ মোক্ষ বা পরম মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।

• মনের পবিত্রতা ও মুক্তি (মনু, ৬.৯২)

সন্ন্যাস অধ্যায়ে মনু মহারাজ মুক্তির ভিত্তি হিসেবে 'দশ লক্ষণ' যুক্ত ধর্মের কথা বলেছেন।

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীবিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।

সরলার্থ: ধৈর্য, ক্ষমা, মনের সংযম, চুরি না করা (অস্তেয়), শুচিতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী (সঠিক বুদ্ধি), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য এবং ক্রোধহীনতা—এই দশটি গুণের চর্চা করলে মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সে মোক্ষের অধিকারী হয়।

• ত্রিগুণাতীত হওয়া (মনু, ১২.২৪)

মোক্ষ লাভের জন্য মানুষের স্বভাবের পরিবর্তনের গুরুত্ব এখানে দেওয়া হয়েছে।

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাত্মনো গুণান্।
যৈর্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্মহান্ সর্বানশেষতঃ॥

সরলার্থ: সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ মনকে প্রভাবিত করে। মোক্ষ পেতে হলে তমঃ (অজ্ঞানতা) ও রজঃ (চঞ্চলতা) গুণ ত্যাগ করে সত্ত্ব গুণে (পবিত্রতা) স্থিত হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই গুণের মায়া কাটিয়ে পরমাত্মার সাথে যুক্ত হতে হয়।

মনুস্মৃতি অনুসারে, মোক্ষ পাওয়ার জন্য কেবল শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (সংযম) এবং নিবৃত্ত কর্ম। মনু স্মৃতি আমাদের শেখায়, যখন মানুষ কর্মফলের আশা ত্যাগ করে এবং জগতের সবকিছুর মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়, তখনই তার আত্মার মুক্তি ঘটে।

আর এই মুক্তিই হচ্ছে মোক্ষ বা মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্যভেদ(গোল)।

তৎ কর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্।।

(বিষ্ণু পুরাণ, ১.১৯.৪১)

অর্থ: সেই কাজই প্রকৃত কর্ম যা মানুষকে বন্ধন (সংসার) থেকে মুক্ত করে আর সেই শিক্ষাই প্রকৃত বিদ্যা যা মোক্ষ প্রদান করে। এর বাইরের সকল কর্ম কেবল পরিশ্রম এবং অন্য সকল বিদ্যা কেবল কারিগরি নিপুণতা মাত্র।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।।

(শ্রীমদ্বিষ্ণুভাগবত পুরাণ, ১১.২.৪২)

অর্থ: যেমন প্রতিটি লোক আহার করলে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি—এই তিনটি ফল একসঙ্গে পায়, তেমনি ভগবানের শরণাগত হলে ভক্তি, ভগবানের অনুভব এবং জাগতিক বিষয়ে অনাসক্তি (বৈরাগ্য) একসঙ্গে উৎপন্ন হয়, যা মোক্ষের পথ প্রশস্ত করে।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্।।

(বিষ্ণু পুরাণ, ৬.৭.২৮)

অর্থ: মানুষের মনই হলো বন্ধন ও মোক্ষের একমাত্র কারণ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের কারণ এবং বিষয়হীন (কামনা-বাসনাহীন) মন মুক্তির কারন।

ন কর্ম্মণামেনুষ্ঠানৈর্ন দানৈস্তপসাপি বা।
কৈবল্যং লভতে মর্ত্যঃ কিন্তু জ্ঞানেন কেবলম্।।

অর্থ: শ্রুত্যাদিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, দান এবং চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারা মানব কৈবল্য-পদ লাভ করিতে পারে না, উহা লাভ করিবার পক্ষে একমাত্র জ্ঞানই সহায়।পদ্মপুরাণ, শিবগীতা - ১/২)

বিভিন্ন পুরাণ অনুসারে দেখা যায় যে মানুষের একমাত্র লক্ষ্যভেদ (গোল) হচ্ছে মুক্তিলাভ করা অর্থাৎ মোক্ষ। আর সেই মোক্ষের ধাপ হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা। জ্ঞানের মাধ্যমেই মুক্তিলাভ সম্ভব।

ফুটবলে যেমন জ্ঞানের মাধ্যমেই গোল(লক্ষ্যভেদ) করা সম্ভব তেমনিই মানব জীবনেও জ্ঞানই হচ্ছে গোল (লক্ষ্যভেদ)।

সবশেষে, জ্ঞান অর্জনই লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আমাদের

পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন ও হিন্দুর অস্তিত্ব সঙ্কট

সুদীপনারায়ণ ঘোষ



অবৈধ অভিবাসী এই শব্দবন্ধ এখন কমবেশি সুপরিচিত। এবং এটা যে অপ্রিয় সত্য সেই বিষয়ে এখন আর কোনো লুকোছাপার জায়গা নেই। কারা অবৈধ সেই বিষয়টাও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে পরিস্ফুট করা হয়েছে। কিন্তু এই অবৈধ অনুপ্রবেশ চোরাগোপ্তা পথে চলেছে কোনো অনির্দিষ্ট সময়বিন্দু থেকে । তবে এটাকে প্রাতিষ্ঠানিক মান্যতা দেওয়া হয় বামফ্রন্টের সময় থেকে। এবং এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল সম্ভবত ১৯৭৯ সালের ১৪ই আগস্ট। বামদলগুলো এই অবৈধ ভোটারদের চুটিয়ে সমর্থন পেয়েছে। এদের প্রথমেই রেশন কার্ড ও ভোটার তালিকায় নাম তোলার কাজটা সম্পন্ন হত। ব্যস, আর কী চাই? ১৯৯১ সাল ও ২০০১ সালের বাংলাদেশের জনগণনায় একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। ১৯৯১-২০০১ এই কালখণ্ডে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১ কোটি কমে গেছে। ওখানকার জন্মহার ও মৃত্যুহার মিলিয়ে ২ কোটি বাড়ার কথা। এর অর্থ তিন কোটি মানুষ গায়েব হয়ে গেছে। এদের একটা অংশ পশ্চিম বাংলায় থেকে গেছে আর বাকিটা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

বামদলগুলো এই ডিভিডেন্ডের পুরো ফায়দা লুটবে, তৃণমূল সেটা সহ্য করতে পারছিল না। তাই তৃণমূল নেত্রী সরাসরি লোকসভায় দাবি তুললেন যে এই অবৈধ লোকদের তাড়াতে হবে। তিনি কোনো সদুত্তর না পেয়ে অধ্যক্ষের দিকে তোড়াবাঁধা কাগজ ছুঁড়ে মারলেন। সেইগুলো ইতিহাসের দলিল হয়ে আছে। আর এখন সেটা অস্বীকার করলে হবে না। দ্বিতীয় কথা হল, তৃণমূল বুঝতে পারল এই ভোটব্যাঙ্ক যদি কব্জা করা যায় তাহলে তো ওই দলের নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত। তারা ২০১১ এ ক্ষমতায় আসার পরে এই অবৈধ অনুপ্রবেশকে সুচারুরূপে শিল্পে পরিণত করে নিল এবং অগাধ অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশ ঘটল তাদের পৌরোহিত্যে। তারা আরও এক কদম এগল। মায়ানমারের অধিবাসী ও বিদ্রোহী রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গাদের বিপুল সংখ্যায় ঢোকাতে শুরু করল। এরা পশ্চিমবাংলায় কাজ না পেয়ে অন্য প্রদেশে গেল কিন্তু ভোটার রইল এখানকার, বিশাল সংখ্যায়।

ভোটের সময়ে এদের আনার জন্য দলীয় উদ্যোগে এখানে বাসে ট্রেনে টিকিট বুক করে নগদ অর্থ দিয়ে আনা হয়। এরা শুধু ভোট দেয় না। এরা ভোটের কিছু আগে থেকে অবস্থান নিয়ে নেয়। ভোটের দিন ও ভোট–

পরবর্তী হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না। জনসংখ্যা বেড়েছে যা তার থেকে ভোটার শতাংশ বেড়েছে অনেক বেশি। এবং এখন যে বিপুল সংখ্যক মানুষ সীমান্তের দিকে দৌড়চ্ছে সেটাই অবৈধ অনুপ্রবেশের দৃশ্যমান প্রমাণ। এখন তৃণমূল চতুরতার সঙ্গে বলছে যে বিএসএফ যা কিনা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অধীন তাদের অনুপ্রবেশ আটকানোর কথা। ঐ দলের যারা একটু পরিণত মস্তিষ্ক তারা বলছে যে এটা বিএসএফের অর্থাৎ বিজেপির ব্যর্থতা। আবার অতি উৎসাহী সমর্থকরা বলছে যে বিএসএফ এমনকি বিজেপি এদের টাকা দিয়ে ঢোকায়। কিন্তু মাটির স্তরে সত্যটা কী?
বিএসএফ কিন্তু কোনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা নয়। প্রথমত, ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় একটা প্রাকৃতিক সমস্যা আছে। সেটা হল উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা দুই জেলা বরাবর সীমান্ত অঞ্চলে এমন নদী ও খালবিল আছে যে, কোন কাঁটাতার দিয়ে অনুপ্রবেশ আটকানো যায় না। একই অবস্থা মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার। এখানে এমন নদী আছে যেগুলো দুই দেশের মধ্য দিয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, বাংলা সরকার একটা বিরাট এলাকায় জমি দেয়নি ইচ্ছা করেই কাঁটাতার দেওয়ার। তৃতীয়ত, বিএসএফের কাজ তাদের আটকানো বা ধরে রাখা নয়। বিএসএফ ওদের ধরে রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তারপর সেগুলো কীভাবে মিশে যায় জনস্রোতে? চতুর্থত, যদি বিএসএফ তাদের রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে না দেয় তাহলেও রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ঐ সব অবৈধ ব্যক্তিদের সনাক্ত করে ফেরৎ পাঠানো। তার অর্থ দাঁড়ায় যে যেদিক দিয়েই দেখিনা কেন শেষাবধি রাজ্য প্রশাসন ও শাসকদলেরই আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব এই অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা।

অবৈধ অভিবাসীদের খুঁজে বের করে, আটক রেখে তারপর তাদেরকে সীমান্ত পার করার ব্যাপারে পশ্চিম বাংলা রাজ্য সরকারের গুরুতর দায়িত্ব আছে। তাদের যে সব উদ্যোগ নিতে হয় তার মধ্যে পড়ে: সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (সংক্ষেপে বিএসএফ)র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্য পুলিশ সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসীদের বিভিন্ন যাচাইকরণ প্রক্রিয়া, তদন্ত প্রতিবেদন ও সাধারণ মানুষের থেকে সংগৃহীত সূত্রের সাহায্যে সনাক্ত করবে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ১৯৪৬এর ফরেনার্স অ্যাক্ট বা বিদেশিআইন ও নানা প্রাসঙ্গিক আইনে তাদের আটক করবে। পুলিশ আটক ব্যক্তিদের জাতীয়তা ও দলিল যাচাই করবে। এই ব্যাপারে তারা বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের সহায়তা নেবে। যাচাই প্রক্রিয়ায় অবৈধ অভিবাসনের বিষয়টা যদি নিশ্চিত হয় তবে রাজ্য সরকার বহিষ্করণ আদেশ জারি করে। তারপর আটক ব্যক্তিদের বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। বিএসএফ এরপর তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যায় সীমান্ত অবধি এবং তাদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করে।
বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা: যাতে মসৃণভাবে তাদের ফেরৎ পাঠানো যায় তা নিশ্চিত করতে বিএসএফ ও রাজ্য পুলিশ বাংলাদেশ সীমান্ত বাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবে। তবে এই বিষয়ে অনেক কঠিন বাধাবিপত্তি আছে। এমন উদাহরণ প্রভূত আছে যেখানে প্রকৃত ভারতীয়দের আটক করে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। সঠিক পদ্ধতি পালন ও সতর্কতা সম্পর্কে অনেক উদ্বেগের জায়গা আছে। এই ফেরৎ পাঠানোর পদ্ধতিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ও আটক ব্যক্তিদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বেগ ও চিন্তার দিক জড়িয়ে আছে। ঐ সব ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমন্বয় সাধন করা এবং আটক ব্যক্তিদের সঙ্গে দয়ালু আচরণ নিশ্চিত করা এই সব কাজে রাজ্য পুলিশকে প্রচুর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়।

অপারেশন সিন্দুর: সাম্প্রতিক এক কড়া পদক্ষেপে ২০০০ বাংলাদেশি অভিবাসীদের ফেরৎ পাঠানোর খবর আছে। বিভিন্ন আদালত সঠিক পদ্ধতির উপর জোর দিয়ে এই ফেরৎ পাঠানো থামিয়ে দিয়েছে বা প্রশ্ন তুলেছে। অভিবাসন আইন, (আসাম থেকে বিতারণ), ১৯৫০ আসামে ব্যবহার করা হচ্ছে ঘোষিত বিদেশিদের বহিষ্কারের জন্য। সম্প্রতি পাঁচজনকে ২৪ ঘণ্টার ভিতরে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। রাজ্য সরকার কোনো যুক্তিতেই এই অবৈধ অনুপ্রেবেশের দায় ঝেড়ে ফেলতে পারে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ নানা প্রলোভনে এই মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরেছে যে এটা বিএসএফের ব্যর্থতা। এটা সর্বৈব মিথ্যা ও মারাত্মক ক্ষতিকর।

বাংলাদেশি অবৈধ অভিবাসীদের হুমকি এবং তাদের বিতাড়নের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জ -

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ৪০৯৬ কিলোমিটার সীমান্তরেখা আছে। বহু দশক ধরে, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ব্যাপক উদ্বেগের কারণ এটা জাতীয় নিরাপত্তা ও জনতাত্ত্বিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। মূল অধিবাসীদের কাছে এরা বোঝা, জাল ভোটার কার্ড বানিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের নাগরিক সেজে যায়। ফলে আসামে ১৯৭৯-৮৫তে এদের বিতাড়ণের দাবিতে আন্দোলন হয়। ১৯৮৫র আসাম চুক্তিতে বলা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বা তার পরে আসামে বসবাসকারী বিদেশীদের চিহ্নিত করে তাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে তাড়ানো হবে। তাও বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। এই অবৈধ অভিবাসীরা ছোটখাটো কাজ করে, সরকারি বেসরকারি জমি জবরদখল করে অবৈধ বস্তি বানায় ও বেআইনি কাজকর্ম করে।

এদের শনাক্ত করে বিতাড়ণে সবচেয়ে বড় বাধা এদের জাতীয়তা প্রমাণ করা। কারণ বহু বছর ধরে এরা জাল আধার কার্ডসহ অন্যান্য নথিপত্র সংগ্রহ করেছে। এরা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গেছে; মুসলিম-তোষণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর থেকে সমর্থন পায়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ধরে কিন্তু বাংলাদেশ নাগরিকত্বের স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া তাদের ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করে। জাল আধার, ভোটার আইডি থাকায় কারণ প্রমাণ করা কঠিন। বাংলাদেশ এদের ফিরিয়ে নিলেও তারা পুন:প্রবেশ করে। বাংলাদেশ এটা স্বীকারই করে না, অনুপ্রবেশ বন্ধেররোধ কার্যকর ব্যবস্থা নেয়।

রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশী অবৈধ অভিবাসী উভয়ের ক্ষেত্রেই, তাদের নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে অনীহা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। মনে রাখতে হবে, কীভাবে এখন ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা গওহর রিজভী জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ভারত যদি তাদের বাংলাদেশী নাগরিকত্ব প্রমাণ করে তবেই অবৈধ অভিবাসীদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এমনকি তিনি ভারতে বাংলাদেশী নাগরিকদের অবৈধ অভিবাসনের বিষয়টিকে দেশের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

কিছু রাজ্য সরকার সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জমি দিতে অসহযোগিতা করে চলেছে। অবৈধদের বেশিরভাগই মুসলিম। সম্প্রতি শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারের ৬০০ কিলোমিটার এলাকায় বেড়া দেওয়ার জমিপ্রদানে অনীহার বিষয় তুলেছিলেন, সেখান দিয়ে অনুপ্রবেশ করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে বিরাট অংশ নদী। সেখানে কাউকে আটকানো বস্তুত অসম্ভব।

২৪ এর ডিসেম্বরে শ্রী অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে বিএসএফ-এর সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগ করেন। "পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশে ২,২১৬.৭ কিলোমিটার সীমান্তের মাত্র ১,৬৪৭.৪৪৬ কিলোমিটার বেড়া দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫৬৯.২৫৪ কিলোমিটারের মধ্যে ৪৫৬.৪৭৪ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত। ২৮৪.৫৬ কিলোমিটারে আইনি বাধা আছে। সরকার জমি অধিগ্রহণের অনুমোদন দিলেও জেলা কর্মকর্তারা তহবিল বিতরণে বিলম্ব ঘটাচ্ছেন। সরকার নদীয়ার করিমপুর সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জমি অধিগ্রহণের অনুমোদন দিয়েছে। ভারতের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন লোকের হাতে বাংলাদেশ চলছে। জমি-অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব স্থানীয় সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক অশুভ জোট বেড়ানির্মাণে প্রধান বাধা। ফলে বিএসএফের পক্ষে অবৈধ অভিবাসীদের প্রবেশ আটকানো কঠিন হয়ে পড়ে। দালালরা পয়সা কামায়।

সীমান্তে বেড়া দেওয়া নির্দিষ্ট কারণে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরোধিতার মুখে পড়ে। ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বেড়া প্রকল্পে সম্প্রতি মণিপুরের সংযুক্ত নাগা পরিষদের থেকে এসেছে। মিজোরামের ছাত্র সংগঠন মিজো জিরলাই পাওল অমিত শাহের কাছে স্মারকলিপিতে ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম বাতিল করে মায়ানমার সীমান্তে বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে দাবি করেছে। মায়ানমার-ভারত দু'দেশের লোকদের ভিসা ছাড়া একে অপরের অঞ্চলে ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রবেশের অনুমতি আছে। মিজোরামে সীমান্ত বেড়া দেওয়ার বিরোধিতাকারীদের মধ্যে কুকি-জো-নাগা খ্রিস্টান সংগঠনগুলো কেন্দ্রকে এফএমআর অব্যাহত রেখে সীমান্ত-বেড়া বাতিলে দাবি জানিয়েছে। মণিপুরের মেইতেই হিন্দুরা সীমান্ত-বেড়ার কেন্দ্রী সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেছে যে চলমান জাতিগত সংঘাতের মূল কারণ মায়ানমারের আন্তঃসীমান্ত মাদক-সন্ত্রাস।

ভারত ও মায়ানমারের কুকি, চিন জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো আফিম চাষ এবং মায়ানমার ও মণিপুর থেকে মিজোরাম ও বাংলাদেশ হয়ে সিন্থেটিক ড্রাগ-সহ মাদকপাচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে আর সেটা কুকি জঙ্গীদের সন্ত্রাসী

কাজে মদৎ দেয়, অস্ত্র কিনে ঐ অঞ্চলকে অস্থির করে আর মেইতেইদের খলনায়ক বানায়।

বাংলাদেশ ১৯৭৫ এর ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নির্দেশিকা উদ্ধৃত করে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া স্থাপনে, ভারতের প্রচেষ্টারও বিরোধিতা করে। এই চুক্তি আন্তর্জাতিক সীমানার (শূন্য রেখা) ১৫০ গজের মধ্যে প্রতিরক্ষা কাঠামো নির্মাণ করা যায় না। বাংলাদেশের দাবি কাঁটাতারের বেড়া "প্রতিরক্ষা কাঠামো", ভারত বলে যে কাঁটাতারের বেড়া, সীমান্তে আলো, প্রযুক্তিগত ডিভাইস স্থাপন এবং গবাদি পশুর বেড়া "সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবস্থা"। এটা আন্তঃসীমান্ত অপরাধমূলক কার্যকলাপ, চোরাচালান, অপরাধীদের চলাচল এবং পাচার বন্ধে জরুরি। ভারতের দাবি ঠিক এই নির্মাণ কোনও প্রোটোকল ভাঙে না।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে, সুকদেবপুরে বিএসএফ-এর চলমান বেড়ানির্মাণ নিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও বিএসএফ কর্মকর্তারা মৌখিক বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। সীমান্তে বাংলাদেশি গ্রামবাসীরা ককটেল বোমা ছুঁড়ে বিএসএফের বেড়া দেওয়ায় বাধা দেয়। বেড়া না থাকায় ভারতে অবৈধভাবে মানুষ, গবাদি পশু এবং পণ্য পাচার হয়।অবৈধ অনুপ্রবেশ, তাদের বেআইনি কার্যকলাপ রোধ করাও বিশাল চ্যালেঞ্জ। কাগজ নাহি দেখায়েঙ্গে' গ্যাং এবং কংগ্রেস, এআইএমআইএম-এর মতো মুসলিম তুষ্টিকর রাজনৈতিক সংগঠনগুলির জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন (এনআরসি) নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া এবং এনআরসি বাস্তবায়নের বিরোধিতা অবৈধ অভিবাসীদের সনাক্তকরণ এবং তাদের বিতাড়নের ক্ষেত্রে আরও জটিলতা তৈরি করে। গোয়েবলসিয়ান প্রচারণার উপর নির্ভর করে, ২০১৯ সাল থেকে ভারতে ইসলাম-বামপন্থী বাস্তুতন্ত্র ভারতীয় মুসলিমদের উসকানি দিতে শুরু করে দাবি করে যে তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হবে এবং তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে এলোমেলোভাবে আটক কেন্দ্রে ফেলে দেওয়া হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো রাজনীতিবিদরা সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত, কুখ্যাত খান মার্কেট গ্যাংয়ের 'অভিজাত' সদস্যরা অ্যামনেস্টির মতো 'মানবাধিকার' সংস্থাগুলিতে মিথ্যা প্রচার করছে যে জাতীয় এনআরসি প্রস্তুত করা হলে মানুষ নাগরিকত্ব হারাবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি তার মুসলিম-সমর্থক পরিচয় জোরদার করার জন্য বিজেপির মতো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে "কাফির" (কাফের) হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, তিনি ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি রাজ্যে এনআরসি বাস্তবায়ন করতে দেবেন না।

এছাড়াও, বর্তমানে নিষিদ্ধ ইসলামপন্থী সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই) কেন্দ্রের নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) এবং এনআরসি আনার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভারতে "গৃহযুদ্ধ" শুরু করার পরিকল্পনা করেছিল। ২০২০ সালে, 'সাংবাদিক' ফায়ে ডিসুজা সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ কাকাদের উত্তর দেওয়ার জন্য একটি 'প্রতারণামূলক শিট' তৈরি করেছিলেন।

এই সমস্ত প্রচারণা, ভয় দেখানো এবং 'কুদরতি বিরিয়ানি' বিশেষ সিএএ/এনআরসি/এনপিআর-বিরোধী বিক্ষোভ ২০২০ সালে দিল্লিতে হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গায় পরিণত হয়েছিল যেখানে ইসলামপন্থী জনতা জাতীয় রাজধানীতে কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালিয়েছিল। একদিকে, ইসলামপন্থীরা সিএএ বাস্তবায়নের বিরোধিতা করেছিল, যা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ এবং অন্যান্য অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান, এই সমস্ত মুসলিম-প্রধান দেশ থেকে ভারতে আসা নির্যাতিত মানুষদের। অন্যদিকে, ২০১৪ সালের আগে, তারা অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করার জন্য এনআরসি আনার কেন্দ্রের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল। মূলত, তারা চেয়েছিল যে ভারত একদিকে নির্যাতিত হিন্দুদের নাগরিকত্ব না দিক এবং অন্যদিকে অবৈধ রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশী মুসলিম অভিবাসীদের সনাক্ত এবং নির্বাসন না করুক।

ইসলামপন্থীদের দ্বারা সংঘটিত সহিংসতা, পাথর ছোঁড়া এবং নৈরাজ্য এবং তাদের রাজনৈতিক ও মিডিয়া মিত্রদের বিরোধিতার ফলে অবৈধ অভিবাসীদের পদ্ধতিগতভাবে সনাক্ত এবং নির্বাসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। আসামে, ২০১৯ সালের আগস্টে এনআরসি তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ৩.৩ কোটি আবেদনকারীর মধ্যে ১৯.০৬ লক্ষ লোক তালিকা থেকে বাদ পড়েছিলেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে, আসামের বিজেপি সরকার ঘোষণা করে যে নতুন আধার কার্ড আবেদনকারীদের জন্য তাদের জাতীয় নাগরিক নিবন্ধক (এনআরসি) আবেদন প্রাপ্তি নম্বর (এআরএন) জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আধার কার্ড

অর্জন এবং ভারতীয় নাগরিকদের পরিচয়পত্র এবং অন্যান্য সুবিধার জন্য এর অপব্যবহার রোধ করা।

অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ এবং অবৈধদের চিহ্নিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও, আসামে এনআরসি বাস্তবায়ন সহ ইসলামপন্থী এবং রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতা ছাড়াই হয়নি। অবৈধ অভিবাসীদের প্রতি অযৌক্তিক সহানুভূতির সাম্প্রতিক প্রদর্শনে, কংগ্রেস নেতা স্যাম পিত্রোদা ভারতে বসবাসকারী অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের সমর্থন জানিয়েছেন এবং অবৈধদের বিতাড়িত করার জন্য মোদী সরকারের প্রচেষ্টার সমালোচনা করেছেন। "আমরা আমাদের গ্রহের কথা ভাবছি না। আমরা বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে চিন্তিত নই... কারণ আমরা দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত অভিবাসীদের তাড়া করতে ব্যস্ত। তারা এখানে আসার জন্য এত কাজ করে... অবশ্যই অবৈধভাবে। আমি বুঝতে পারছি এটা ঠিক নয় কিন্তু, আমরা অবৈধ বাংলাদেশি এবং সংখ্যালঘুদের লক্ষ্যবস্তুতে ব্যস্ত", তিনি বলেন।

২০২০ সালে দিল্লিতে হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা এবং উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের অন্যান্য অংশে সিএএ/এনআরসি/এনপিআর নিয়ে সহিংসতা দেখায় যে প্রকৃত শরণার্থীদের থাকার ব্যবস্থা, ভারতীয় নাগরিকদের থেকে অবৈধ অভিবাসীদের আলাদা করার এবং তাদের নির্বাসনের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা দেশের অভ্যন্তরে সহিংসতা এবং নৈরাজ্যের মুখোমুখি হচ্ছে। তাই অবৈধদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিতাড়নের বিষয়টি মোকাবেলা করার সময় সরকারের সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে।

এছাড়াও, মানবিক উদ্বেগের আড়ালে জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুর রাজনীতিকরণ এবং অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়নের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে দোষারোপ করার প্রচেষ্টা বিষয়টিকে আরও তীব্র করে তোলে। একদিকে, কেন্দ্র অবৈধদের চিহ্নিতকরণ এবং বিতাড়ন করতে চায় এবং নতুন অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে চায়, অন্যদিকে মুসলিম তুষ্টিকর সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ভারতীয় সহ-ধর্মীয়দের আকৃষ্ট করার জন্য অবৈধ রোহিঙ্গা মুসলিমদের ভারতে অবস্থান অব্যাহত রাখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তাদের পথের বাইরে চলে যায়। স্পষ্টতই, 'ধর্মনিরপেক্ষ' দলগুলির জন্য জাতীয় নিরাপত্তার চেয়ে রাজনৈতিক সুবিধা প্রাধান্য পায়।

এর একটি প্রধান উদাহরণ জাতীয় রাজধানী নয়াদিল্লিতে দেখা গেছে যেখানে আম আদমি পার্টি সরকার রোহিঙ্গা অবৈধ অভিবাসীদের স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা ছিল দিল্লি সরকার। তবে, কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করে বলেছে যে কোনও অবৈধ অভিবাসীকে EWS ফ্ল্যাট দেওয়া হবে না এবং UNHCR শরণার্থী কার্ড থাকা ভারতে অবৈধদের কোনও আইনি মর্যাদা দেয় না কারণ UNHCR কার্ড ভারতীয় আইন দ্বারা স্বীকৃত নয়। এছাড়াও, এটিও রিপোর্ট করা হয়েছিল যে AAP সরকার এবং তার বিধায়ক আমানতুল্লাহ খান দিল্লির মদনপুর খাদার এলাকায় 300 জন রোহিঙ্গা মুসলিমের অবৈধ বসতি স্থাপনে সহায়তা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। যখন AAP সরকার অবৈধদের বসতি স্থাপনের জন্য কাজ করছিল, তখন AIMIM নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি একবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং অবৈধ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের "অবৈধ অভিবাসী" বলে অভিহিত করার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মন্ত্রী সিং-এর মন্তব্যকে "কপট" বলে অভিহিত করেছিলেন।

এটি এমন এক সময়েও আসে যখন জানা যায় যে রোহিঙ্গারা মূলত বাংলাদেশে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল অতিক্রম করে ভারতে পৌঁছাচ্ছে বস্তুগত সুবিধার সন্ধানে, তারা ভারতে অর্থনৈতিক শরণার্থী, যারা অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে যখন তারা ভারতে পৌঁছায়, তখন তারা নির্যাতিত/নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের পরিবর্তে অর্থনৈতিক অভিবাসী।

বিচারিক হস্তক্ষেপ ইতিমধ্যেই জটিল নির্বাসন প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে। ২০২১ সালে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট জম্মু থেকে অবৈধ রোহিঙ্গা অভিবাসীদের মিয়ানমারে নির্বাসনের অনুমতি দেয় এবং উল্লেখ করে যে ভারতে বসতি স্থাপনের মৌলিক অধিকার কেবল ভারতীয় নাগরিকদের। ২০২৪ সালের জুনে, ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে এবং তাদের ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেয়। যদিও আদালত কিছু ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের উপর জোর দিয়ে অবৈধদের নির্বাসনের অনুমতি দিয়েছে, অবৈধ মুসলিম অভিবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীলরা প্রায়শই অবৈধ অভিবাসীদের অপসারণ রোধ করতে আদালতের

দরজায় কড়া নাড়ছে। এনআরসি এবং সম্পর্কিত আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদন এবং মামলাগুলি ব্যবস্থা গ্রহণে আরও বিলম্ব ঘটায়।

ভারতীয়দের "যদি আমেরিকা তা করতে পারে তবে ভারত কেন নয়" এই ধারণা থেকে বাঁচতে হবে।" সর্পিল যদিও কলম্বিয়া, মেক্সিকো, এমনকি ভারত থেকে আসা অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ প্রশংসনীয়, তবে "যদি ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার কয়েক দিনের মধ্যেই এটি করতে পারেন তবে মোদী সরকার কেন একই কাজ করবে না?" এই প্রশ্নটি একটি কিশোরী ক্ষোভ। ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি অনেক আলাদা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অভিবাসন এবং নির্বাসনের জন্য একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইনি কাঠামো রয়েছে। তাদের কাছে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এর মতো সংস্থা রয়েছে যারা অবৈধদের দ্রুত নির্বাসন কার্যকর করে, যারা বেশিরভাগই তাদের জন্মভূমিতে নিপীড়ন থেকে বাঁচতে বা রাষ্ট্রহীন হওয়ার চেয়ে উন্নত অর্থনৈতিক সুযোগ এবং একটি সুন্দর জীবনের সন্ধানে আসে।

ভারতে, প্রক্রিয়াটি অনেক কম সুবিন্যস্ত এবং বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ দ্বারা বাধাগ্রস্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, যা প্রয়োজন ছিল তা হল রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি এবং আইনের কঠোর বাস্তবায়ন যাতে অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কার করা যায় কারণ কলম্বিয়া সরকারের সাম্প্রতিক ইউ-টার্নের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অবৈধদের তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়া নিশ্চিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থানকে কাজে লাগাতে পারে।

তাছাড়া, ভারত বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সাথে একটি ছিদ্রযুক্ত সীমান্ত ভাগ করে নেয়, যেখানে মোট সীমান্তের মাত্র ৩০ কিলোমিটার, ১৬২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বেড়া দেওয়া হয়েছে এবং এমনকি বেড়া দেওয়াও আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছাড়া আসে না। এছাড়াও, ভারতের বিপরীতে, যেখানে দেশের ফেডারেল কাঠামো কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়কেই ক্ষমতায়ন করে, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও কেন্দ্রীভূত ফেডারেল কাঠামো রয়েছে যা রাজ্যগুলির প্রতিরোধ সত্ত্বেও অবৈধদের বিতাড়নের নীতি বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক। সুতরাং, এই প্রেক্ষাপটে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতির তুলনা করলে দুটি বৈচিত্র্যপূর্ণ গণতন্ত্রের নীতি বাস্তবায়ন এবং শাসনের সূক্ষ্ম বাস্তবতা মিস হয়ে যায়।

কোভিডের ভুল ব্যবস্থাপনা এবং ক্রমবর্ধমান চীনা প্রভাবের কারণে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহারের নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করার সময় "যদি আমেরিকা তা করতে পারে তবে ভারত কেন নয়" এই প্রশ্নটিও উত্থাপিত হয়েছিল। তবে, অপইন্ডিয়া ব্যাখ্যা করেছে যে কেন এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণ ভারতের জন্য ভালো ধারণা নয়।

চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, অবৈধ রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি অভিবাসীদের নির্বাসন অব্যাহত রয়েছে অবৈধ অভিবাসীদের সনাক্তকরণ, আটক এবং নির্বাসন প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে কঠিন, তবে চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাসন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অবৈধ অভিবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগও চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও বাংলাদেশ সর্বদা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী তার নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে উদাসীন, একটি ধীর কিন্তু লক্ষণীয় অগ্রগতির খবর পাওয়া গেছে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে, ভারত অবৈধদের সনাক্তকরণ এবং নির্বাসনের জন্য একটি বিশেষ অভিযানের অংশ হিসাবে মধ্য দিল্লিতে অবস্থানরত ১৪ জন বাংলাদেশি অবৈধ অভিবাসীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে। একইভাবে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লি পুলিশ ৮ জন বাংলাদেশি অবৈধকে নির্বাসন দেয়।

২০২১ সালে, ভারত জম্মু থেকে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গাকে নির্বাসন দেয়। জম্মুর একটি শিবির থেকে ১৭০ জন রোহিঙ্গা অবৈধকে নথি যাচাইয়ের জন্য আটক করার পরে এবং পরে হীরানগর কারাগারে পাঠানোর পরে এটি ঘটে। চ্যালেঞ্জ, আন্তর্জাতিক তদন্ত এবং প্রচারণা সত্ত্বেও তাদের অনেককে অবশেষে ভারতের নির্বাসন প্রচেষ্টার রূপরেখা দিয়ে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে, ৪০০ টিরও বেশি পরিবারের বিদ্যুৎ ও জল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এবং অবৈধ অভিবাসীদের দ্বারা অবৈধভাবে দখল করা জমির জন্য উচ্ছেদের আদেশ জারি করা হয়েছিল। অভিযানের সময় পুলিশ চার রোহিঙ্গাকেও গ্রেপ্তার করেছিল।

দিল্লিতে, পুলিশ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে একটি বড় অবৈধ অভিবাসন চক্রের সন্ধান করে এবং ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে, যাদের মধ্যে নথি জালকারী, আধার অপারেটর এবং জাল ওয়েবসাইট তৈরিতে জড়িত প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

৯ ডিসেম্বর, ছত্তিশগড়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা বলেন যে কর্তৃপক্ষ রাজ্য থেকে প্রায় ৮৫০ জন অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে বহিষ্কার করেছে। শর্মা ভিলাইতে এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন যেখানে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে বহিষ্কার করা হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০০ অবৈধ বাংলাদেশীকে বস্তার থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং ৩৫০ জনকে কাওর্ধা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত বছর, বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ বাংলাদেশী অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করেছে। কিছু ক্ষেত্রে, অবৈধরা অপরাধমূলক কার্যকলাপেও জড়িত ছিল। ২০২৪ সালের আগস্টে, দিল্লি পুলিশ একটি চার্জশিটে বলেছে যে বাংলাদেশি অবৈধরা অবৈধ অঙ্গ প্রতিস্থাপন চক্র পরিচালনা করছে।

২০২৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী, দিল্লি পুলিশ ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও থাকার জন্য দিল্লির একটি হোটেল থেকে সাতজন বাংলাদেশি নাগরিক মোহাম্মদ বেল্লাল, মোহাম্মদ ইয়াসিন, ইমন হোসেন, মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, মোহাম্মদ রুবেল হোসেন, নাসরুদ্দিন এবং তানভীর হাসানকে গ্রেপ্তার করে। বাংলাদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

২০২৪ সালের মে মাসে, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং জানান যে রাজ্যের কামজং জেলায় ৫৪৫৭ জন অবৈধ অভিবাসী শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের সকলকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এর মধ্যে ৩৫৯ জন স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে ফিরে এসেছেন। এর আগে ৩৮ জন অবৈধ অভিবাসীমণিপুর থেকে অবৈধ অভিবাসীদের মায়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়েছে, যার ফলে ৮ মার্চ ২০২৪ সাল থেকে মোট অবৈধ মায়ানমারী অভিবাসীর সংখ্যা ৭৭ জনে দাঁড়িয়েছে।

২০২৪ সালের জুন মাসে, অপইন্ডিয়া জানিয়েছে যে মণিপুর সরকার এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলি মায়ানমার থেকে অবৈধ অভিবাসীদের সাহায্যকারী জাল আধার এবং ভোটার আইডি গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ চুরাচাঁদপুর জেলায় বসবাসকারী মায়ানমার থেকে আসা দুই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের কাছ থেকে জাল পরিচয়পত্র উদ্ধার করেছে। পরবর্তী মাসগুলিতেও একই ধরণের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছিল।

২০১৮ সালে, সীমান্তবর্তী শহর জিরভিম এবং মোরেহ থেকে পরিচালিত দুটি জাল আধার কার্ড র‍্যাকেটের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। গ্রেপ্তার হওয়া ১০ জনের মধ্যে ৯ জন মায়ানমার থেকে আসা অবৈধ মুসলিম অভিবাসী ছিলেন। তামিলনাড়ুর একজন ভারতীয় মহিলা পারিথা বেগমকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ মোরেহের মোহাম্মদ তোম্বার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুটি ল্যাপটপ, চারটি আধার কার্ড, একটি প্রিন্টার মেশিন, একটি ল্যামিনেটিং ফিল্ম মেশিন, প্লাস্টিক শিট, ডিভিডি এবং ফটো পেপার জব্দ করেছে। একইভাবে, ২০১৮ সালের মে মাসে, ইম্ফল শহর থেকে জাল আধার কার্ড সহ প্রায় ৯৮ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

২০২১ সালের অক্টোবরে, আসাম রাইফেলসের সৈন্যরা মণিপুরের টেংনোপাল জেলায় ভারত-মায়ানমার সীমান্তে জাল আধার কার্ড নিয়ে ভ্রমণকারী ২৪ জন বার্মিজ অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছিল। জাল আধার কার্ড ব্যবহার করে দিল্লিগামী বিমানে ওঠার চেষ্টা করার সময় ইম্ফল বিমানবন্দরে ১১ জন মায়ানমার নাগরিককে গ্রেপ্তার করার প্রায় এক সপ্তাহ পরে এই ঘটনা ঘটে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে, কলকাতার শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশন থেকে দুই মহিলা সহ তিনজন রোহিঙ্গা মুসলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

২৮শে জানুয়ারী ২০২৫ তারিখে, রাজস্থানের জয়পুর পুলিশ অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে ৩৯৪ জন রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশী নাগরিক সহ ৫০০ জনকে আটক করে। জয়পুরের পুলিশ কমিশনার বিজু জর্জ জোসেফ বলেন যে অপরাধমূলক কার্যকলাপ মোকাবেলা এবং অবৈধ অভিবাসীদের সনাক্ত করার জন্য এই অভিযান শুরু করা হয়েছে।

অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়নের ক্ষেত্রে ভারত অসংখ্য বাধা এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও, প্রক্রিয়াটি কখনও স্থবির ছিল না। সরকার এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলি সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার, স্মার্ট বেড়া, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, কূটনৈতিক সংলাপ সহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে অবৈধ অভিবাসীদের ভারতে প্রবেশ রোধ করা এবং দেশের সীমান্ত শক্তিশালী করা। সম্প্রতি, দিল্লি পুলিশ "বাংলাদেশ সেল" পুনরুজ্জীবিত করতে শুরু করেছে, যা "বিদেশী সনাক্তকরণ সেল" নামেও পরিচিত, যা জাতীয় রাজধানী জুড়ে যেসব এলাকা, বস্তি, অননুমোদিত উপনিবেশ এবং শ্রম শিবিরে অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীদের উপস্থিতি সন্দেহ করা হয়, সেখানে বসবাসকারীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বাংলাভাষী পুলিশ সদস্যদের নিয়ে গঠিত। এই পুলিশ কর্মকর্তাদের অবৈধদের সনাক্তকরণ, আটক এবং নির্বাসন দেওয়ার জন্য তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়নের ক্ষেত্রে সমস্ত আইনি, লজিস্টিক এবং ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ, সকল মহল থেকে রাজনৈতিক বিরোধিতা এবং জড়িত অন্যান্য জটিলতা মোকাবেলা করছে। কেন্দ্রীয় সরকার, নিরাপত্তা সংস্থা এবং পুলিশের উদ্যোগের প্রচেষ্টা থেকে, অবৈধ অভিবাসনের সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য একটি বহু-স্তরের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে, ভারতে বসবাসকারী অবৈধ রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশী অভিবাসীদের এবং প্রায়শই অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার হুমকি এখনও শেষ হয়নি। তবে, আন্তর্জাতিক তদন্ত এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার কথা চিন্তা না করে ভারতের উচিত নির্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।
ভারতের উচিত ভারত-মিয়ানমার এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রযুক্তি এবং জনবল বৃদ্ধি করে সীমান্ত নিরাপত্তা নজরদারি জোরদার করা। দেশটির পরিচয় যাচাইয়ের জন্য একটি বিস্তৃত ডাটাবেসও সংহত করা উচিত, মোদী সরকারের এখনই সময় এসেছে NRC-এর সতর্কতামূলক কিন্তু কার্যকর বাস্তবায়ন বিবেচনা করার। যদিও বাংলাদেশ ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছে, বিশেষ করে ২০২৪ সালের আগস্টে ইসলামপন্থীরা দেশটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর, ভারতের উচিত দেশটির সাথে প্রত্যাবাসন চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা। মিয়ানমারের সাথেও একই ধরণের আলোচনার প্রস্তাব করা উচিত। অবৈধদের সাথে সম্পর্কিত আদালতের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া এবং পরবর্তী নির্বাসনেও সহায়তা করতে পারে। নথিপত্র ক্রস-চেকিং, সন্দেহভাজন অবৈধদের উৎস অনুসন্ধান এবং অননুমোদিত বসতি ট্র্যাক করা হল অবৈধদের ধরা এবং তাদের নির্বাসন দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ যে পদক্ষেপগুলিতে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে তার মধ্যে কয়েকটি।
কঠোর আইন প্রয়োগ, রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি, নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এনআরসি, এনপিআর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ভারত অবৈধ অভিবাসন এবং নির্বাসনের এই জটিল সমস্যাটি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে পারবে। ভারত সম্পূর্ণরূপে অবৈধ অভিবাসীমুক্ত না হলেও তা কমছে, প্রতিটি পদক্ষেপ দেশকে এক সমাধানের কাছাকাছি নিয়ে আসছে। তবে এখনও অনেক কিছু করার বাকি আছে।
দেশভাগের পর থেকে বাংলার, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বর্তমানে শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছে। নিচে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. ধর্মীয় বিন্যাসের পরিবর্তন – আদমশুমারির তথ্য
সমগ্র রাজ্যের পরিসংখ্যান:
- ১৯৫১: হিন্দু ৭৮.৪৫%, মুসলিম ১৯.৮৫%
- ২০১১: হিন্দু ৭০.৫৪%, মুসলিম ২৭.০১%
- অর্থাৎ, গত ৬০ বছরে হিন্দু জনসংখ্যার হার ৭.৯১% হ্রাস পেয়েছে এবং মুসলিম জনসংখ্যার হার ৭.১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।
২০২৬ সালের প্রক্ষেপণ/দাবি:
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৩% হলো মুসলিম।
- অন্যান্য প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৩০-৩৫%এ পৌঁছাতে পারে বলে

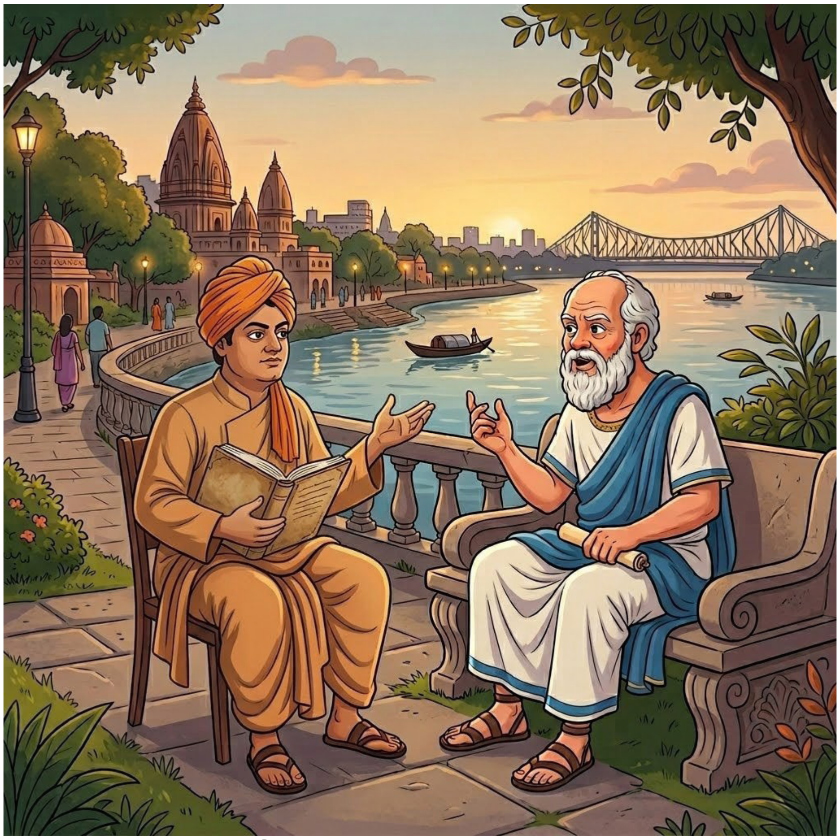
প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।
জেলা-ভিত্তিক পরিসংখ্যান (২০১১ সালের আদমশুমারি):
তিনটি জেলা মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ:
- মুর্শিদাবাদ: ৬৬.২৭% মুসলিম
- মালদা: ৫১.২৭% মুসলিম
- উত্তর দিনাজপুর: ৪৯.৯২% মুসলিম
আরও বেশ কয়েকটি জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা ২৫-৩৭% এর মধ্যে রয়েছে: বীরভূম ৩৭.০৬%, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৩৫.৫৭%, নদিয়া ২৬.৭৬%, উত্তর ২৪ পরগনা ২৫.৮২%।

২. বৃদ্ধির হার
২০০১-২০১১ সালের আদমশুমারির মধ্যবর্তী সময়ে:
- হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার: ১০.৮% (যা ১৯৯১-২০০১ সালে ছিল ১৪.২%)।
- মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার: ২১.৮% (যা ১৯৯১-২০০১ সালে ছিল ২৫.৯%)।
- উভয় হারই হ্রাস পেয়েছে, তবে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এখনও হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের প্রায় দ্বিগুণ।

৩. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: দেশভাগের প্রভাব
১৯৪৭-পরবর্তী দেশভাগের ফলে ব্যাপক জনচলাচল বা অভিবাসন ঘটেছিল:
- ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে প্রায় ১৬.৩ লক্ষ

সক্রেটিস ও নরেন্দ্রনাথ দত্তঃ প্রসঙ্গ রামচন্দ্র, রাবণ ও বিবিধ বিষয়ে একটি কাল্পনিক কথোপকথন

রুদ্র শঙ্কর আদিত্য



(বিকালবেলা, স্থান গঙ্গার তীর, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একজন লোক গম্ভীর ভাবে পায়চারি করছে। তার মুখে চিন্তার চাপ। কাছে গিয়ে বোঝা গেল যে তিনি সক্রেটিস।)

নরেন্দ্রনাথ: এত চিন্তিত কেন মশাই? আজ আবার মাথায় নতুন কোন ভাবনা ঢুকল? মাঝে মাঝে সময় পেলে তো মস্তিষ্ককে একটু আধটু বিশ্রামও তো দিতে পারেন।

সক্রেটিস: আর বিশ্রাম....!? সবকিছু দেখেও কিভাবে চোখ বন্ধ করে থাকি বলো! যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে একটা পিঁপড়েও নিপীড়িত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মত যুক্তিবাদীদের মাথায় চিন্তা থাকবে কিভাবে তার দুর্দশার সমাধান করা যায়। এসব বিষয়েই ভাবছিলাম।

নরেন্দ্রনাথ: বাহ! অতীব উত্তম চিন্তা। কিন্তু আমি তো আশেপাশে কোন পিঁপড়ে কে নিপীড়িত হতে দেখছি না এখনও পর্যন্ত (হাস্য)।

সক্রেটিস: (কিছুটা বিব্রত হয়ে) তোমার মাথায় এগুলো ঢুকবে না। তুমি দেখেও দেখছো না। এর কারণ কি জানো? তুমি অন্ধ ভক্ত।

(কিছুটা পন্ডিত ভাব নিয়ে) তোমাদের রামনবমীর কথাই ধরো না। প্রতি বছর যারা জয় শ্রীরাম বলে নিরীহ মানুষদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেয় তারাই ঘটা করে তাদের উগ্রবাদী আদর্শ রামকে দিয়ে নিরীহ গোবেচারা রাবণের কুশপুত্তুলিকায় আগুন দেওয়ায়। পৃথিবীর নিয়ম হয়ে গেছে এটা নরেন্দ্র, অনার্যরা সবসময় আর্যজাতির দ্বারা নির্যাতিত হয়ে এসেছে। আর্যরা মূলত শূদ্র বিদ্বেষী।

নরেন্দ্রনাথ: আচ্ছা! আর্য-অনার্য বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলুন তো।

সক্রেটিস: (কিছুটা উৎসাহ নিয়ে) আর্যরা হচ্ছে বহিরাগত ব্রাহ্মণ, তাদের চেহারা উজ্জ্বল ও সুঠাম।। আর অন্যদিকে অনার্যরা হচ্ছে মূলনিবাসী। আর্যরা বাইরে থেকে এসে তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের সবকিছু লুটে নিয়ে গেছে। তোমাদের প্রভু রাম ছিলেন আর্য আর লঙ্কার অনার্য রাজা রাবণ....

নরেন্দ্রনাথ: আচ্ছা। এসব তথ্য কোথায় পেলেন আপনি?

সক্রেটিস: কেন? ইতিহাস তো এই কথা বলছে। এমনকি তোমাদের রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণকে হত্যা করার কথা বর্ণনা করা আছে।

নরেন্দ্রনাথ: (মৃদু হেসে) আপনি ঠিকই বলেছন সক্রেটিস। রামায়ণ ইতিহাসেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, রামায়ণের বর্ণনা অনুযায়ী রাবণ তো ব্রাহ্মণ, বিদ্বান ও শিবভক্ত ছিলেন। আর রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়। এমনকি আপনি আর্যদের যে গাঁয়ের রঙের বর্ণনার কথা বলছেন রামায়ণ অনুযায়ী তার সাথে তো রামের বর্ণনা

মিলে না। রামের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল ছিল না। বরং বিষয় উল্টো হয়ে যায়। শূদ্র বিদ্বেষ বলে তুমি রামের দিকে আঙ্গুল টানছো। কিন্তু দেখো, রাবণ কখনোই শূদ্র নয়। সে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভুত ঋষি পুলস্তের পুত্র। শুধুমাত্র রাবণ নয়, মহিষাসুর, হিরণ্যকশিপু এরা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের অন্যায় কৃতকর্মের সাজা ভোগ করেছে। রামায়ণেই দেখুন না,নিষাদরাজ গুহক কিংবা শবরীর দৃষ্টান্ত অথবা উত্তর কাণ্ডের ধোপা।। তারা তথাকথিত নিচু হওয়া সত্ত্বেও প্রভু রামচন্দ্র কিভাবে তাদের সমুচিত মূল্যায়ন করেছেন।। সুতরাং, আর্য-অনার্য তত্ত্ব দ্বারা বিভ্রান্তি এবং শূদ্র বিদ্বেষ যোগ করা মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়।

সক্রেটিস: (কিছুটা ধাক্কা খেলো) তা না হয় বুঝলাম। তোমার কথাতেই আসি... তুমিই স্বীকার করে নিয়েছো রাবণ একাধারে একজন ব্রাহ্মণ, বিদ্বান ও শিবভক্ত ছিল। রাম কি করে পারলো এমন একজন মানুষকে হত্যা করতে? রাবণ জীবিত থাকলে হয়তো পৃথিবীতে তার মেধার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারতো।
নরেন্দ্রনাথ: দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য। দেখো এত এত গুণ থাকতেও তার অধঃপতন। রাবণের হাজারটা ভালো গুণ থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে তার করা অপরাধকে......
সক্রেটিস: (কিছুটা উত্তেজিত এবং মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) কার অপরাধ? কিসের অপরাধ?
রাবণের অপরাধ কি ছিল? সে তো শুধু তার বোন শূর্পনখার অপমানের বদলা নিয়েছে। আমার তো মনে হয় এরকম দাদা প্রত্যেকটি বোনের জীবনে এমনকি প্রতিটি ঘরে ঘরে থাকা উচিত। শূর্পনখার নাক কেটে দিয়ে লক্ষণ বুঝি খুব ভালো কাজ করেছিল? আমার যতদূর স্মরণ হয়, সে তো লক্ষণ কে শুধু তার ভালোবাসার কথাই জানিয়েছিল? এটা কি অপরাধ?
নরেন্দ্রনাথ: (কিছুটা তাচ্ছিল্যের হাসি) আপনাদের যুক্তিবাদীদের এই এক দোষ..
যেকোনো ঘটনা আপনাদের অর্ধেক মনে পড়ে বাকি অর্ধেক মনে পড়েনা। আদৌ মনে পড়ে না নাকি মনে করতে চান না নাকি জানেনই না। আসলে কি তা একমাত্র ভগবান জানে।
সক্রেটিস: (কিছুটা বিব্রত)
নরেন্দ্রনাথ:(স্থির ভাবে) আপনার কথা শুনে আপাতভাবে লক্ষণকে নারীবিদ্বেষী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছিল তা ভিন্ন। নিরপেক্ষভাবে সবটা জানার চেষ্টা করলে আপনি এতদিনে উত্তর পেয়ে যেতেন। রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ঘটনাটি বর্ণিত রয়েছে।
শূর্পনখা প্রথমে রামচন্দ্রের কাছে যায় এবং গিয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য বলে। কিন্তু রাম বলেন তিনি তো বিবাহিত এবং মাতা সীতা তার স্ত্রী; এটা শুনে শূর্পণখা লক্ষণের কাছে গিয়ে একইভাবে তাকে বিয়ে করার জন্য বলে। কিন্তু লক্ষণ তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এতে ক্রোধান্বিত হয়ে শূর্পনখা মাতা সীতার নামে কুমন্তব্য করে নানান গালিগালাজ করতে থাকে। এমনকি তাকে মেরে ফেলার জন্য তার উপর হামলা করে। সেই মুহূর্তে লক্ষণ তার নাক-কান কেটে দেয়। লিঙ্গের বিষয়টি একপাশে রেখে নিরপেক্ষভাবে একটু চিন্তা করুন তো, কেউ যদি আপনার স্ত্রীকে হত্যা করতে উদ্যত হতো তখন কি করতেন? নিশ্চয়ই আপনি বোকার মত গিয়ে তাকে শান্তি ও প্রেমের বাণী শোনাতেন না। অবশ্য আপনাদের দিয়ে বিশ্বাস নেই, আপনারা যুক্তিবাদী মানুষ। যাইহোক, শূর্পনখা তারপর লঙ্কায় পালিয়ে যায়।
সক্রেটিস: (তোতলাতে তোতলাতে) না.. আআআ ঠিক আছে। মানলাম শূর্পনখা এক্ষেত্রে দোষী। কিন্তু তুমি চিন্তা করো রাবণ যদি তার বদলা না নিতো তাহলে লঙ্কার জনগণ তা কি মেনে নিতে পারতো? একটা রাজ্যের রাজকুমারীর নাক কাটা গিয়েছে অথচ রাজা কিছুই করতে পারছে না। রাবণের মতো একজন ন্যায়পরায়ণ পরিশ্রমী শাসক যে তিলে তিলে সোনার লঙ্কা তৈরি করেছে সে কি জনগণের মতের অবমূল্যায়ন করতে পারতো? সে যদি ভুল করতো তাহলে তো তার রাজ্যের জনগণই তার বিরোধিতা করতো? সে তো আর ভুল কিছু করেনি, তাইনা?
নরেন্দ্রনাথ: প্রথমত, রাবণের সোনার লঙ্কা এটা কোনভাবেই রাবণের কৃতিত্ব নয়। সোনার লঙ্কা নিয়ে যদি কোন প্রশংসা বা দূর্নাম পাওয়ার কথা থাকে তা যক্ষরাজ কুবেরের। এমনকি রাবণ তার কাছ থেকে অমূল্য পুষ্পক রথ পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছিল। কুবেরের সৈন্যদেরকে মেরে সে তার রাক্ষসদের দিয়ে ভোজন করিয়েছিল। রাবণ

একাধারে অত্যাচারী,ডাকাত ও এতটাই পাষণ্ড যে তার ভয়ে ইন্দ্রের সিংহাসন পর্যন্ত কাঁপে আর তার রাজ্যে কার সাহস আছে রাবণের বিরোধিতা করার?? বিভীষণের অবস্থা তো দেখেছেন কি হয়েছে? শুধুমাত্র নিজের ভাই বলে হয়তো বা প্রাণে মারেনি।

সক্রেটিস: কিন্তু...উউউউউ
নরেন্দ্রনাথ: (তীক্ষ্ণভাবে) শূর্পনখা রাবণ এর কাছে গিয়ে কখনোই এটা বলেনি যে, দাদা তুমি আমার অপমানের বদলা নাও। আপনি হয়তো এমনটাই শুনতে চেয়েছিলেন।
কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। যা হয়েছিল,শূর্পনখা রাবণ কে গিয়ে সীতার রূপের বর্ণনা দিতে থাকে এবং তাকে অপমান করে বলে সীতা একমাত্র তার উপপত্নী হবার যোগ্য; কিন্তু সে কাপুরুষ হওয়ার কারণে কিছুই করতে পারছে না। তাছাড়া নিজের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য শূর্পনখা এই মিথ্যাচার করে যে সীতাকে রাবণের জন্য আনতে গিয়েই তার নাকের এই অবস্থা। সীতার অপরূপ রূপের বর্ণনা শুনে কামুক রাবণ সহজেই প্রলুব্ধ হয়। তারপরের ঘটনা তো জানেনই।
সক্রেটিস: (তার ঠোঁট কাঁপছে কিন্তু আত্মবিশ্বাস কমেনি) তারমানে রাবণ নারীলোভী ছিলো? তুমি এমনটাই বলতে চাইছো। কিন্তু রাবণের স্ত্রী মন্দোদরিকে পঞ্চ সতীর একজন বলা হয়। এরকম পবিত্র সতী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও রাবণ এমনটা করতে পারে? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? যদিওবা পূর্বে দু একটা এমন ঘটনা ঘটে থাকতো তাও মানা যেত?
নরেন্দ্রনাথ: আপনার ভিতরে অতিমাত্রায় যুক্তিবাদ ঢুকে গিয়েছে সক্রেটিস! ঠিক আছে, আপনাকে আমি একটা কাজ দিলাম।। রম্ভা নামে এক রমনীকে রাবণ জোর-জবরদস্তি করে ধর্ষণ করেছিল। এমনকি রম্ভা তাকে বলেছিল যে আমি আপনার মেয়ের মতো। তাও সে ক্ষান্ত হয়নি। একই রকমের ঘটনা আরো কয়েকটি রয়েছে। সেগুলো আপনি খুঁজে খুঁজে বের করুন। তারপরেও যদি আপনার রাবণকে ধর্ষক বলে মেনে নিতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনি অনেক দূরে চলে যান...একেবারে পাগলা-গারদের দিকে...

সক্রেটিস: (লজ্জায়) তুমি আমাকে বারবার বিব্রত করছো নরেন্দ্রনাথ! কিন্তু পূর্বে অন্য নারীর সাথে রাবণ খারাপ ব্যবহার করলেও সীতার সাথে সে কোন ধরনের খারাপ আচারণ করে নি। তুমি কি শুননি রাবণ তাকে কত সম্মান ও মর্যাদার সাথে অশোকবনে নিয়ে রেখেছিল? এমনকি তার সাথে কোনদিন উচ্চস্বরে কথা পর্যন্ত বলেনি? এটাও অস্বীকার করতে পারো?
নরেন্দ্রনাথ: (অট্টহাস্য এবং কিছুক্ষণ পর থেমে গিয়ে) আপনার কথা শুনে আমার খুব হাসি পাচ্ছে সক্রেটিস। কিন্তু সেই সময় মাতা সীতার সাথে যা ঘটেছিল তা ভেবে আমার এখনো কান্না পায়। (গম্ভীর মুখে) আপনাকে আগেই আমি ব্যাখ্যা করেছি যে একজন ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়ার পরেও তো রাবণ কতটা অধঃপতিত ছিল। তাই, হঠাৎ করে এমন কোন আধ্যাত্মিক শক্তি তার ভেতর প্রবেশ কখনোই করেনি যে সে একদিনে সাধু হয়ে গেল। সে আসলে যেরকম সেরকমই ছিলো। সীতাকে অপহরণের পর সে বারবার তাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল। এমনকি হনুমানের বর্ণনাতেও পাওয়া যায় তার অনুগত রাক্ষসীরা কিভাবে...

সক্রেটিস: এ আর এমন কি!??
নরেন্দ্রনাথ: (রাগী চোখে) অধঃপতনের শেষ পর্যায়ে রাবণ তাকে দুই মাসের সময় দিয়েছিল। দুই মাসের মধ্যে যদি সে রাজি না হয় তাহলে এমনও বলেছিল যে, সীতাকে সে তার রান্নাঘরে পাঠিয়ে দেবে কেটে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলার জন্য। রাবণ ও তার সৈন্যরা যে নিকৃষ্ট নরমাংসভোজী ছিলো তার প্রমাণ পূর্বেই দিয়েছি। রাবণ যদি যুদ্ধ করে সীতাকে অধিকার করতো তাও কোনভাবে নাহয় মানা যেত। কিন্তু সে একজন তপস্বীর বেশে পরস্ত্রীকে হরণ করেছে। এরকম একজন একাধারে ধর্ষক, নরমাংসভোজী, কাপুরুষ, ভন্ড, অত্যাচারী ও দস্যুকে ভালো মানুষ সাজানোর জন্য তোমরা উঠে পড়ে লেগেছো। আসলে রাবণের থেকে নিকৃষ্ট তো এরকম তথাকথিত যুক্তিবাদী মানুষগুলো।

সক্রেটিস: (কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে) এগুলো আমার অজ্ঞতার ফল। আমি আসলে বুঝতেই পারিনি। রামায়ণ ভালোভাবে না পড়ার ফলে এবং বিভিন্ন মানুষের মুখ থেকে নানান কথা শুনে আমার মনে এই বিভ্রান্তিগুলো জন্ম নিয়েছিল। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ নরেন্দ্র। আমার জ্ঞান উন্মোচন করে দিয়েছো। কিন্তু, আমার আরেকটি অভিযোগ রয়েছে।
জয় শ্রীরাম বলে যারা অন্য মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে দেয় তাদের বিষয়টি তুমি কিভাবে জাস্টিফাই করবে? দেখো রাম কাদের আদর্শ....

নরেন্দ্রনাথ: প্রভু রামচন্দ্র ভারতবর্ষের আপামর সবার আদর্শ। কেউ যদি তার নাম কে বিকৃত কাজের জন্য ব্যবহার করে তার দায়ভার কখনো প্রভু রামের উপর বর্তায় না। পৃথিবীতে ধর্মের নামে হানাহানি কি কম হয়েছে? আপনি একটু ইতিহাসের দিকে তাকান... পৃথিবীতে কোন জাতি হিন্দুদের থেকে বেশি নির্যাতিত হয়েছে? আরবের যাযাবররা কি ভারতবর্ষে এসে হিন্দুদের উপর লুণ্ঠন করেনি? ভগবান গৌতম বুদ্ধ পরবর্তী বৌদ্ধদের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা কি ভারতের কম ক্ষতি করেছে? কিংবা ক্রুসেডের নামে খ্রিস্টানরা আর কি কি চালিয়েছে সেগুলো নাই বললাম.....
সহজ বাংলায় বলি, সর্দি লাগলে নিশ্চয়ই টোফেন সিরাপ খান.. কিন্তু একই সিরাপ অনেকে নেশার দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করে। এতে সিরাপের দোষ টা কোথায়? যে মানুষ যেরকম তার ব্যবহারের ক্ষেত্রও সে রকম হবে।
মানুষের মনের সকল অন্ধকার দূর হোক। রামনবমীর নামে যদি কোন হয়রানি আদৌ হয়ে থাকে ভগবান রামের নিকট প্রার্থনা করি তা বন্ধ হোক, তাদের সুবুদ্ধি হোক এবং আপনার ও সুবুদ্ধি হোক। আপনাকে রামনবমীর শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা!
একটা শেষ কথা বলি, কখনো প্রশ্ন করা বন্ধ করবেন না তবে যুক্তিবাদের নামে জানতে জানতে জানোয়ার হয়ে যাবেন না কখনো।

সক্রেটিস: ঠিক বলেছ তুমি।(দীর্ঘশ্বাস)
নরেন্দ্রনাথ: তাহলে আমার সাথে লম্বা দম নিয়ে বলুন,"জয় জয় সীতা রাম।
সক্রেটিস: জয় জয় সীতা রাম।(উৎফুল্ল ভাবে)



তাড়কা বৃত্তান্তঃ আর্য আগ্রাসন না কি অধর্মের বিনাশ?

অর্ণব দত্ত

রাক্ষসী তাড়কা, আমাদের ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম বিতর্কের বিষয়।
উনিশ শতকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক দ্বারা বিশেষত ম্যাক্স মুলারের দ্বারা প্রচারিত আর্য-অনার্য তত্ত্ব অনুযায়ী বাইরের শ্বেতাঙ্গ আর্যরা দেশীয় অনার্যদের ওপর আক্রমণ করে পরবর্তীতে তাদের (আর্যদের) নিজস্ব সংস্কৃতি দেশীয়দের ওপর চাপিয়ে দেয়। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে শ্রীরামকে আর্যদের এবং তাড়কাকে দেশীয় অনার্যদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নেমে পড়ে কিছু অরাজক তত্ত্ব। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পেরিয়ার ই.ভি.রামস্বামী। কিন্তু এইসব কিছুর আগে আমাদের দেখে নেওয়া উচিৎ শ্রীমদবাল্মিকী রামায়ণে বাস্তবে তাড়কার বংশের ব্যাপারে কি লেখা আছে।

তাড়কার পরিচয়:

বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ডের পঁচিশ-ছাব্বিশ তম সর্গে আমরা পাই, তাড়কার পিতার নাম ছিল মহাযক্ষ সুকেতু। দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকায় তিনি ব্রহ্মার আরাধনা করেন এবং তাঁর আশীর্বাদে তিনি তাড়কা নাম্নী কন্যাকে প্রাপ্ত করেন। উল্লেখ্য, পিতামহ ব্রহ্মার আশীর্বাদে তাড়কার শরীরে সহস্র হাতির বল ছিল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে ক্রমে যুবতী হয়ে উঠলে জম্ভপুত্র সুন্দের (এক দৈত্য) সাথে তার বিয়ে হয়। কালক্রমে তাদের মারীচ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের অভিশাপে তার স্বামী সুন্দ, নিহত হলে তাঁকে ভক্ষণ করতে তাড়কা তার পুত্রকে নিয়ে চলে তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের রাক্ষস ও রাক্ষসী হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন অগস্ত্য। অর্থাৎ, আমরা জানলাম তাড়কা পূর্বে এক যক্ষী ছিলেন। ঋষিশাপে রাক্ষসী হয়ে যান। এই ঘটনা কে বিকৃত করে নানাভাবে দেখানো হয়, যেমন এক ধারাবাহিকে দেখানো হয়েছে ঝড়ের সময় সুন্দ ক্ষুধার তাড়নায় খাবার খুঁজতে বেরিয়ে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে খাবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন। তাই তাঁর শিষ্যরা হাতাহাতি করতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত অগ্নিকুণ্ডে পরে যায়। কিন্তু, আমরা বাল্মীকি রামায়ণে এই ঘটনার উল্লেখ পাইনা।

যাই হোক, মূলকথায় ফিরে আসি। এক্ষণে আমরা জানলাম যে তাড়কা এক যক্ষী ছিল, কোনো সাধারণ ছাপোষা

বনচারিণী অবলা নারী নয়।

মলদ ও করূশ জনপদ আক্রমণ:

রামায়ণের আদিকাণ্ডের চব্বিশতম সর্গে দেখতে পাই যে, ইন্দ্রের কৃপাধন্য ,সমৃদ্ধ, ধনধান্যে ভরা মলদ ও কারুষ সহস্র হস্তীর বলসম্পন্না রাক্ষসী তাড়কা ধ্বংস করে দেয়। তার বাহুদুটি বর্তুলাকার, বিরাট তার মস্তক, বিরাট তার দেহ। তার আরো এক পুত্র ছিল-মারীচ; যে নিজেও ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী। ধ্বংস করার পর থেকে কোনও লোক থাকতে না পারায় সেই জনপদ গভীর বনে রূপান্তরিত হয়। তাড়কা নিছক কোনো বনবাসী ছিলেন না, বরং তিনি ঋষিদের যজ্ঞ বিনাশকারী ও ত্রাস ছিলেন।

শ্রীরামের ও লক্ষ্মণের ভূমিকা:

মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাড়কা ও তার পুত্র তথা রাক্ষস নিধনের জন্য মহারাজ দশরথের থেকে অনুমতি নিয়ে বনে গমন করেন এবং পথিমধ্যে অস্ত্র শিক্ষা দিতে থাকেন। রাক্ষসী তাড়কা নিধন কিভাবে ধর্মসংগত তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঋষিবর বলেন (আদিকাণ্ডের 25 তম সর্গের ষোলো থেকে বাইশতম শ্লোক দ্রষ্টব্য) - স্ত্রীহত্যা হবে এই ভেবে তুমি পিছিয়ে যেয়ো না। চাতুর্বর্ণ্যের রক্ষার দ্বারা সমাজের কল্যাণের জন্য রাজপুত্র দ্বারা এই হত্যা কর্তব্যবিশেষ।প্রজাবর্গকে রক্ষা করার জন্য নিষ্ঠুর হোক বা করুণই হোক, পাপযুক্তই হোক বা দোষযুক্তই হোক, রাজকর্তব্য পালন করতেই হবে। রাজ্যপালনের ভার যাদের উপর সমর্পিত, এই হচ্ছে তাদের চিরন্তন কর্তব্য। যেহেতু এই রাক্ষসীতে ধর্মের লেশমাত্রও নেই, সেজন্য অধর্মচারিণী এই রাক্ষসীকে তুমি হত্যা করো। উদাহরণ হিসেবে তিনি ইন্দ্র কর্তৃক বিরোচন কন্যা মন্থরার (কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা নয়) হত্যা, এরপর বিষ্ণু কর্তৃক ভৃগুপত্নী কাব্য তথা শুক্রাচার্যের মাতা যিনি স্বর্গলোককে ইন্দ্রশূন্য করতে চেয়েছিলেন তার হত্যার কথা তুলে ধরেন।

শ্রীরামের প্রতি তাঁর এই উপদেশ যেন শ্রীমদভগবত গীতার - " স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহঃ"র প্রতিধ্বনি।

বাল কাণ্ডের ছাব্বিশতম সর্গে দেখি, যুদ্ধে শ্রীরাম তাড়কাকে প্রথমে প্রাণে মারতে চাননি। তিনি লক্ষ্মণ কে বলেন- তিনি রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করে তাকে নিবৃত্ত করবেন।নারীরূপে সে রক্ষণীয়া হলেও তার গতি ও শক্তি তিনি বিনষ্ট করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিশ্বামিত্র তাঁদের আশীর্বাদ করেন। তাড়কা মায়া দ্বারা ধূলোর মেঘে মুহূর্তকালের জন্য তাদের আচ্ছন্ন করেন। স্বীয় মায়ার দ্বারা তাদের ওপর প্রভূত শিলা বর্ষণ করে, এতে রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হন। শরবর্ষণ দ্বারা সেই শিলাবর্ষণকে প্রতিহত করে তার দুই হাত কর্তন করেন। তাড়কা তাতেও না দমে গর্জন করতে থাকলে লক্ষ্মণ তার নাক ও কান কেটে দেন। তাড়কা তখন অন্তর্নিহিত হয়ে পুনরায় শিলাবর্ষণ করতে থাকে। কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্র মুনি তাঁদের বলেন, রাক্ষসীর প্রতি করুণা না করে সন্ধ্যার আগেই তাকে হত্যা করতে। কারণ তখন তাদের মায়া আরো বেশি বর্ধিত হয়।রাম শব্দভেদী বাণ দিয়ে রাক্ষসী কে নিরুদ্ধ করেন। তখন সর্পিণীর মতো তাঁদের ওপর আক্রমণ করতে গেলে রাম তার বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করেন। সে ভূপতিত হলো এবং মারাও গেল। এই ঘটনার পর ইন্দ্রাদি দেবগণ "সাধু" "সাধু" বললেন এবং তাঁদের বন্দনা করলেন।

অর্থাৎ, আমরা বুঝলাম, তাড়কা কে মূলনিবাসী হিসেবে দেখিয়ে এবং শ্রীরাম কে আর্যদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখিয়ে যে মিথ্যাচার করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যারা রামায়ণ বা এই লেখাটি পড়েছেন, তারা ভবিষ্যতে এইসব রাজনৈতিক মিথ্যাচারের ফাঁদে পা দেবেন না এইসব আশা রাখি।

এই লেখা লেখার সময়ে আমি ডঃ আচার্য ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর অনূদিত শ্রীমদবাল্মিকী রামায়ণকে আশ্রয় করেছি।

জয় শ্রীরাম
হর হর মহাদেব
জয় মা ভবানী

। শ্রীসচ্চিদানন্দর্পেণমস্তু ।

শাস্ত্রের আলোকে সীতার প্রতিমা

মৃগাঙ্ক রায়



রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রের মতোই সীতা চরিত্র নিয়েও যুগে যুগে বহু আলোচনা, বিতর্ক ও মতভেদ দেখা যায়। তবে সেই সব মতানৈক্যের মধ্যেও সীতার চিরপবিত্রতা, তাঁর অটল সতীত্ব ও অনন্য পতিব্রতা ধর্মের পক্ষে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ, বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

মাতা সীতাকে বাল্মীকি রামায়ণে 'অযোনিজা' বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যার যোনি থেকে জন্ম হয় নি। মাতা সীতার জন্মপ্রসঙ্গে রামায়ণে জনক বলেছেন -

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা।
বীর্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা।।

(বাল্মীকি রামায়ণ, আদি কাণ্ড, ৬/১৩-১৫)

অনুবাদ: অনন্তর একদিন ক্ষেত্রকর্ষণ করতে করতে লাঙ্গলের রেখা থেকে একটি কন্যাকে পাই। ক্ষেত্র-শোধনকালে হলরেখা থেকে উত্থিত এজন্য লোকে তাকে সীতা' বলে। ভূতল থেকে উঠে সে আমার আত্মজা রূপে বড়ো হয়েছে। আমার এই অযোনিজা কন্যা বীর্যশুল্কা হবে এই স্থির করেছি।

তবে, অদ্ভুত রামায়ণ ও অন্যান্য কিছু স্থানে পাওয়া যায় যে - রাবণ পত্নীর গর্ভে গৃৎসমুদ ঋষির মন্ত্রপুত ঘৃত

হতে সীতার জন্ম হয়। সেক্ষেত্রে অযোনিজা বিষয়টি সিদ্ধ হয় না। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা সমাধান হিসেবে বলতে পারি - এটা অন্য কোন কল্পের হতে পারে। যাই হোক, উপরে বাল্মীকি রামায়ণের শ্লোকে 'বীর্যশুল্কা' শব্দ রয়েছে; এই শব্দ দ্বারা মূলত বুঝানো হচ্ছে - বীরত্ব প্রকাশ করে নিতে হবে এমন। একারণেই শিব প্রদত্ত হরধনুতে জ্যারোপণ করার শর্তেই মিথিলা অধিপতি জনক সীতাকে বিবাহ দেওয়ার শর্ত রেখেছিলেন। ভগবান শ্রীরাম কৃত হরধনুতে জ্যারোপণ করার সময় হরধনু ভেঙে যায় এবং রাম সীতার বিবাহ সম্পন্ন হয়।
বিবাহের পর রাম সীতাকে পাশাপাশি কেমন মনে হচ্ছিল সে নিয়ে দেখা যাক -
দেবাধিপতি বিভূ বিষ্ণু যেমন লক্ষ্মীর সঙ্গে, তদ্রূপ উত্তম অভিলাষিণী রাজকন্যা সীতার সঙ্গে রাজর্ষি (দশরথের) পুত্র রামচন্দ্র সানন্দে মিলিত হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন। (বাল্মীকি রামায়ণ, আদি কাণ্ড, ৭৭/২৯)
এখানে যদিও মনে হতে পারে রাম ও সীতাকে শুধু বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মাত্র কিন্তু, ইঙ্গিত হিসেবে নেওয়াটাই উচিত হবে। কারণ যুদ্ধ কাণ্ডে রয়েছে -

সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপেতিঃ।
বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।

(১১৭/২৭-২৮, খণ্ডাংশ)

অর্থাৎ, সীতাদেবী লক্ষ্মী এবং আপনিই প্রজাপালক কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণু। আপনারা রাবণ-বধের নিমিত্তই মনুষ্য দেহ ধারণ করেছেন।
সীতা যে মূল প্রকৃতি সে নিয়ে রামায়ণ নির্ভর কাহিনী অন্যত্রও পাওয়া যায়। অমলেশ ভট্টাচার্যের বই হতে পাওয়া যায় -
ভারতের চিরসীমন্তিনী হিন্দু নারীর অক্ষয় সিঁথির সিন্দূর। চিরগৌরব সতীত্বের রক্তরাগ। মহাকবি কালিদাস তাই বলেছেন, "বর্ষাতায়েন রুচমভ্রঘনাদিবেন্দো... ধৃতিমতীং" - বর্ষাপগত শরৎজ্যোৎস্নার মতো ধরিত্রীদেবী সীতা (রঘুবংশ, ১৩/৭৭)। জগৎপ্রকৃতি সীতারই আলম্বন বিভাব।
এছাড়াও, শ্রুতিতেও রাম ও প্রকৃতি স্বরূপা সীতার যুগল মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায় -

প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসো জটাধরঃ।
দ্বিভুজী কুণ্ডলী রত্নমালী ধীরো ধনুর্দ্ধরঃ।।
প্রসন্নবদনো জেতা ধৃষ্ট্যষ্টকবিভূষিতঃ।
প্রকৃত্যা পরমেশ্বর্য্যা জগদ্‌যোন্যাঙ্কিতাঙ্কভৃৎ।।

(অথর্ববেদ, রামতাপনীয় উপনিষদ, পূর্ব ভাগ, ৩/৭-৮)

অনুবাদ: শ্রীরাম প্রকৃতি-রূপা সীতার সহিত বর্তমান আছেন। শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র পরিধান, জটা-ধারী, দ্বিভুজ, কুণ্ডলবান, রত্নমালাবিভূষিত, প্রশান্তমূর্ত্তি, ধনুর্দ্ধর, প্রসন্ন-বদন, বিশ্ববিজয়ী, প্রগলভ এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি-বিভূষিত। ইহার অঙ্কদেশে মূলপ্রকৃতিরূপা পরমৈশ্বর্য্যশালিনী জগতের যোনিভূতা সীতা-দেবীকে ধারণ করিয়াছেন
মাতা সীতার পতিভক্তি নিয়ে রামায়ণে পাওয়া যায়। রাম যখন পিতৃসত্য গ্রহণ করে বনবাসে যাওয়া স্থির করেন তখন মাতা সীতাও সঙ্গে যেতে চান কিন্তু রামচন্দ্র কোনোভাবেই নিবেন না। মাতা সীতা সেসময় বলেছিলেন -

ব্যতিক্রমং ন বেৎস্যামি স্বর্গোহপি হি ন মে মতঃ।
স্বর্গেহপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব।
ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে।।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২৭/২১)

অনুবাদ: রঘুনন্দন! তোমা-ব্যতিরেকে স্বর্গও আমার কাম্য নয়। নরোত্তম! তোমাকে ছাড়িয়া যদি আমাকে স্বর্গে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ স্বর্গ আমি কখনই প্রার্থনা করিব না অতএব আমি মৃগ-বানর-হস্তিপূর্ণ অতিদুর্গম অরণ্যে গমন করিব।
মাতা সীতার সৌন্দর্য, শুদ্ধতা ও পতিব্রতা ধর্মের প্রশংসা স্বয়ং রাক্ষসী শূর্পনখা রাবণের নিকট করেছে। যদিও উদ্দেশ্য ছিল সীতার প্রতি রাবণের কাম বাসনার উদ্রেক করানো কিন্তু যে বর্ণনা দেখা যায় সেটা সত্যই - "সেই রামের সীতা নামে এক প্রেয়সী ধর্মপত্নী আছে, তাহার নয়ন যুগল সুদীর্ঘ, মুখমণ্ডল চন্দ্রতুল্য, সেই নীতা নিরন্তর



স্বামীর প্রিয় ও হিতসাধনে তৎপর থাকে।" (অরণ্যকাণ্ড, ৩৪/১৫)
রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডে সরাসরি পাওয়া যায় সীতাকে রাবণ অনেক প্রলোভন দেখিয়েছেন কিন্তু সীতা সর্বদা নিজের উত্তম চরিত্র ধারণ করে ছিলেন। একটি মাত্র তৃণ দ্বারা প্রাচীর নির্মাণ করে নিজের সতীত্ব রক্ষা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু, প্রশ্ন উঠে রাবণ বধের পর কেন সেই সতী সাধ্বী সীতাকে রাম অগ্নিপরীক্ষা দিলেন? অগ্নিপরীক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে বাল্মীকি রামায়ণেই সমাধান আছে -
"রাম ক্ষণকাল চিন্তা করে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে বললেন, সীতা রাবণগৃহে দীর্ঘকাল ছিলেন, সেজন্য এঁর শুদ্ধি আবশ্যক, নতুবা লোকে বলবে দশরথপুত্র রাম মূর্খ ও কামুক। আমি জেনেছি সীতা অনন্যহৃদয়া, ইনি নিজের তেজেই রক্ষিতা, রাবণ এঁকে মনে মনেও ধর্ষণ করতে পারেনি। নিজের কীর্তির ন্যায় সীতাকেও আমি ত্যাগ করতে পারি না।" (যুদ্ধকাণ্ড, ১১৮/১১-২০, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)
কিন্তু, তারপরেও আমাদের মনের সংশয় দূর হয় না। তবে দেবী ভাগবত সহ বিভিন্ন পুরাণে আবার পাওয়া যায় - রাবণ কৃত সীতা হরণ হবে এই জ্ঞান পূর্বেই রাম সীতার হয়েছিল। তাই, আসল সীতা অগ্নির নিকটে থাকেন আর ছায়া সীতাকেই মূলত রাবণ হরণ করেন। আসল সীতা ফিরিয়ে আনতেই অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। আনন্দ রামায়ণে আবার বলা হয়েছে - সীতা তিনগুণময়ী, তমগুণময়ী ছায়ারূপ সীতাই রাবণ হরণ করেছে, শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী সীতা রামের বাম অঙ্গে লীন হয়েছেন। (আনন্দ রামায়ণ, সার কাণ্ড, ৭/৬৭-৬৭)।
তবে আরেকটি বিষয় আমাদের মনে সংশয় উৎপন্ন করে - রামচন্দ্র উত্তরকাণ্ডে সীতাকে ঠিকই পরিত্যাগ করেছিলেন যদিও যুদ্ধকাণ্ডে বলেছেন সীতাকে উনি ত্যাগ করতে পারেন না। এছাড়াও অযোধ্যাকাণ্ডেও পাওয়া যায় - সীতা যেমন রামের প্রতি অনুগত, রামকে ছাড়া কোন কল্পনা করতে পারেন না তেমনি রামও সীতাকে ছাড়া এক মুহুর্ত থাকতে পারেন না। তাই ত রাম বলেছেন - 'ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে।...' (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০/২১, খণ্ডাংশ)
অর্থাৎ, মৈথিলী, অধিক কি বলিব? চতুর্দশবৎসর দূরে থাকুক, তোমার বিরহের শোক আমি একমুহূর্তও সহ্য করিতে পারিব না।
তাহলে উত্তরকাণ্ডের বিষয়টির সমাধান কি? - মূলত প্রজাবিদ্রোহই ছিল এই পরিত্যাগের মূলে। তাছাড়া, সীতাকে পরিত্যাগ করে রাম নিজেও অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন। প্রজার মন রক্ষায়, তাদের সুখী করতে রাম দুঃখের মুকুট মাথায় নিয়েছিলেন, ত্যাগ করেছিলেন নিজের সুখ, সীতাও ছিলেন সেই দুঃখের অংশীদার; আর এটাই রাম সীতাকে, এই উপমহাদেশের মানুষের নিকট আরাধ্য বানিয়েছে, মহান বানিয়েছে। রামের বিষয়টি নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন -

'কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সগৌরবে ধরাধামে দুঃখ মহত্তম।'

সীতার ক্ষমার আদর্শও উজ্জ্বলভাবে রামায়ণে জ্বল জ্বল করছে। যখন রাবণ বধের পর হনুমান সীতাকে রামের নিকট আনয়ন করতে যান তখন হনুমান সীতাকে বলেছিলেন - 'রাক্ষসী তোমাকে তর্জন করত, যদি অনুমতি দাও তো মুষ্টিপ্রহারে বা পদাঘাতে বা দংশন করে বা নাসাকর্ণ ভক্ষণ করে বা কেশাকর্ষণ করে এদের হত্যা করি।' তখন সীতা প্রতিউত্তরে উপদেশ দেন - 'শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাপকর্ম্মার পাপভাগ গ্রহ করে না। অতএব আমি যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা কখনও উল্লঙ্ঘন করিব না; কারণ, চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ। সাধুব্যক্তির পাপী, পুণ্যাত্মা কিংবা প্রাণদণ্ডের যোগ্য ব্যক্তিকে দয়া করিতে হয়; কারণ, জগতে অপরাধী কে না হয়? যাহাদের বৃত্তিই পরকে হিংসা করা ও সদা পাপকার্য্য করা এবং যাহারা ক্রুর, সাধুব্যক্তি তাহাদেরও অমঙ্গল করিবে না।'

(যুদ্ধ কাণ্ড, ১৩/৪৪-৪৬)

স্বামী বিবেকানন্দের বর্ণনা দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করছি -

"ভারতবর্ষে যাহা কিছু কল্যাণকর, বিশুদ্ধ ও পবিত্র, সীতা বলতে তাহাই বুঝায় ; নারীর মধ্যে নারীত্ব বলিতে যাহা বুঝায় — সীতা তাহাই। সীতা ধৈর্যশীলা, সহিষ্ণু, চির-বিশ্বস্তা, চির-বিশুদ্ধা পত্নী। তাঁহার আজীবন দুঃখের মধ্যে রামের বিরুদ্ধে একটিও কর্কশ বাক্য উচ্চারিত হয় নাই। সীতা কখনও আঘাতের পরিবর্তে আঘাত দেন নাই। 'সীতা ভব' — সীতা হও।"

(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, রামায়ণ-প্রসঙ্গে)

তথ্যসূত্র:

১) বাল্মীকি রামায়ণ - শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য এম এ কৃত বঙ্গানুবাদ (সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত আর্য্যশাস্ত্র হতে প্রকাশিত)
২) বাল্মীকি রামায়ণ সারানুবাদ - রাজশেখর বসু
৩) অদ্ভুত রামায়ণ - নবকুমার দত্ত
৪) রামায়ণ কথা - অমলেশ ভট্টাচার্য
৫) অথর্ববেদ, রামতাপনীয় উপনিষদ - শ্রীমহেশচন্দ্র পাল



বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু

স্নেহা গাইন
তথ্য সহযোগিতা :- মৃগাঙ্ক রায়

মেদিনীপুর শহরের অদূরবর্তী হাবিবপুর গ্রামে (মতান্তরে কেশপুর থানার অন্তর্গত মোহবনী গ্রামে) ৩রা ডিসেম্বর ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন মাতৃভূমির চরণে নিবেদিত বিদ্রোহী আত্মা ক্ষুদিরাম বসু। ছয়/সাত বছর বয়সে মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে তাঁর পিতা ত্রৈলোক্যনাথ এবং মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতা মাতার চতুর্থ সন্তান। পরপর দুই ছেলের অকালমৃত্যুর পর চতুর্থ সন্তানের জীবন রক্ষার আশায় তৎকালীন সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাঁর মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী তাঁকে প্রতীকিভাবে তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী অপরূপা রায়ের কাছে তিন মুঠো খুদ (ভাঙা চাল) এর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এই 'খুদ' এর বিনিময়ে কেনা হয়েছিলো বলেই তাঁর নাম রাখা হয় 'ক্ষুদিরাম'। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী অপরূপা দেবীর ছত্রছায়ায় ও স্নেহ ভালোবাসায় তিনি বড় হয়ে ওঠেন। অপরূপা দেবীর স্বামী অমৃতলালবাবুর চাকরির জন্য স্থান বদলের কারণে ক্ষুদিরামকেও নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো।

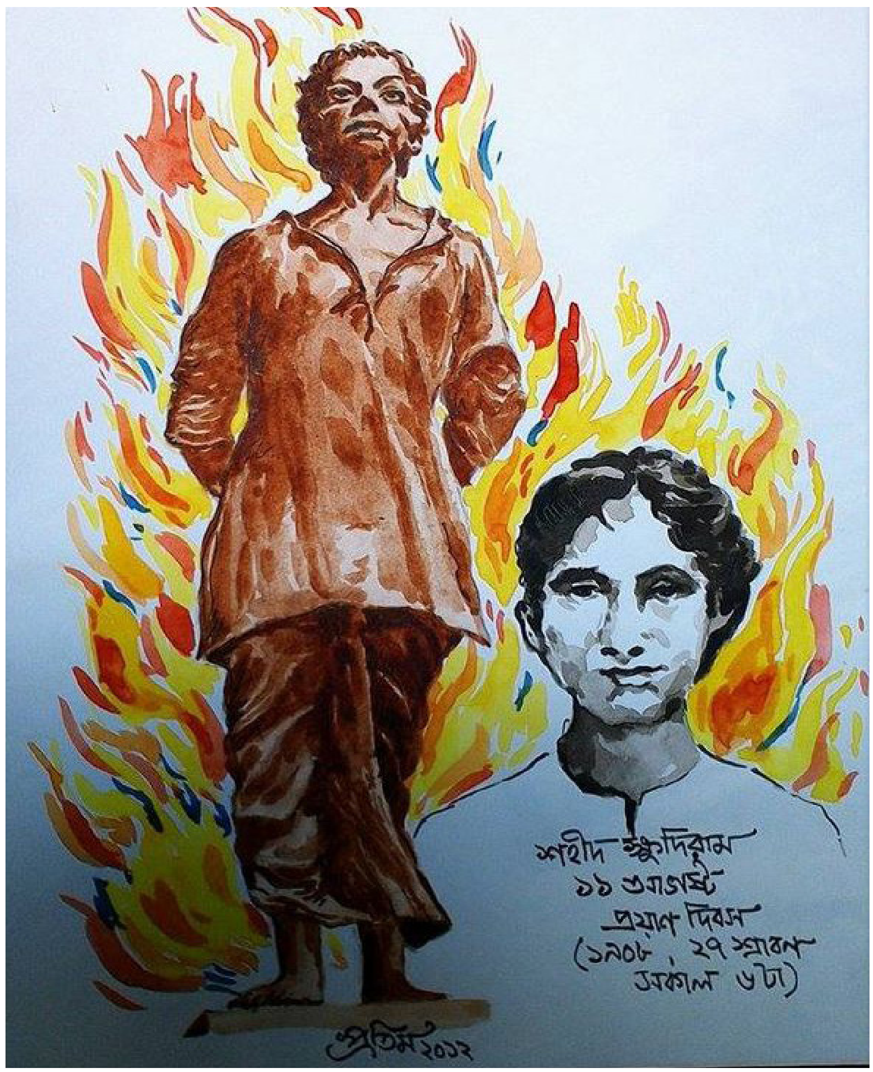
ক্ষুদিরাম বসুর শিক্ষাজীবন শুরু হয় তমলুকের হ্যামলিটন স্কুলে, ১৯০২ সালে তিনি অপরূপা দেবীর স্বামী অমৃতলাল বাবুর সাথে তমলুক শহর থেকে মেদিনীপুরে চলে আসেন। সেখানে তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। মেদিনীপুরে আসার পর থেকেই তাঁর বিপ্লবী জীবনের অভিষেক। তিনি সেবা এবং দুঃসাহসিক কাজের প্রতি উৎসাহী দেখে তাঁর এক সহপাঠী একদিন তাঁকে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সেই সময় বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন খুব জোরালো হয়ে উঠেছিল। তিনি চেয়েছিলেন

অল্পবয়সী ছেলেদের নিয়ে একটি দল গড়ে তুলতে। যুব সমাজ যে দেশের ভবিষ্যৎ সেটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং যুবসমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি ক্ষুদিরামকে সেই দলে যুক্ত করেন। এই দলে যোগ দেওয়ার পর ক্ষুদিরাম হয়ে উঠলেন অন্য এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। লাঠি খেলা শিখলেন, ব্যায়ামের দ্বারা শরীরকে আরো মজবুত করে তুললেন। এই সময় তিনি উপলব্ধি করেন সেবাই পরম ধর্ম। তিনি সংকল্প নিলেন গ্রামের দরিদ্র অসহায় মানুষগুলোর পাশে থাকার, তাদেরকে সেবা করার। প্রাকৃতিক দূর্যোগ আসলে এই সহায় সম্বলহীন মানুষগুলোর দুর্দশার অন্ত থাকতো না। তখন ক্ষুদিরাম বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থসংগ্রহ করে এইসব মানুষকে সাহায্য করতেন। ১৯০৬ সালে কাঁসাই নদীর বন্যার সময় তিনি ত্রাণকাজ চালান।

ক্ষুদিরাম বসু তাঁর প্রাপ্তবয়সে পৌঁছানোর অনেক আগেই একজন ডানপিটে, রোমাঞ্চপ্রিয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯০২-০৩ সালে যুগান্তর দলের বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ ঘোষ আর সিস্টার নিবেদিতা মেদিনীপুর ভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে জনসমক্ষে বক্তব্য রাখেন। এসব দেখে ক্ষুদিরাম বিপ্লবে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত হন। এখানেই তাঁর বিপ্লবী জীবনের অভিষেক। বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু করার কিছুদিনের মধ্যে তিনি সবার চোখে গুরুত্বপূর্ণ এবং সক্রিয় সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বিলাতি দ্রব্য বয়কট, বিলাতি লবণের নৌকা ডোবানো প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তিনি। ইতিমধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এবং রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিলো। এটি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ব্রিটিশবিরোধীদের দ্বারা পরিচালিত হতো। ওই সংগঠনের নেতা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ওনার নেতৃত্বে ক্ষুদিরাম "সোনার বাংলা" শীর্ষক বিপ্লবাত্মক ইশতেহার বিলি করে গ্রেপ্তার হন।

এই সময়ে ক্ষুদিরাম বসু তাঁর শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" পড়তে অনুপ্রাণিত হন। "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" র আদর্শ, শিক্ষা তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়, অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর, সাহস এনে দেয় তাঁর মনে। এরপর এই অদম্য সাহস পেয়ে তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে অনুপ্রাণিত হন। বিপ্লবী রাজনৈতিক দল "যুগান্তর" এ যোগদান করেন। ১৬ বছর বয়সে ক্ষুদিরাম পুলিশ স্টেশনের কাছে বোমা পুঁতে রাখেন এবং ইংরেজ কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করেন। একের পর এক বোমা হামলার দায়ে তাকে আটক করা হয়।

পরবর্তীতে এক অত্যন্ত দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করেন ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকী। তারা লক্ষ্য করেন তখনকার সময়ের কুখ্যাত বড়লাট কিংসফোর্ড ঠিক কোন সময় ইউরোপিয়ান ক্লাবে আসেন। সবকিছু ঠিকঠাক রেখে তাঁরা একদিন রাত আটটায় বোমা নিয়ে পথে অপেক্ষা করছিলেন। সামনের একটি গাড়ি আসতেই তাঁরা সেই বোমা ছুঁড়ে দেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেদিন গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না বরং ছিলেন



জনৈক ব্রিটিশ মিসেস কেনেডি এবং মিস কেনেডি। তারা দুজনেই মারা যান।
ইউরোপিয়ান ক্লাবের সামনে তিনজনকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ক্ষুদিরামের বিচার শুরু হয় **২১শে** মে **১৯০৮** সালে যা বোমা মামলা নামে পরিচিত। বিচারকের আসনে ছিলেন ব্রিটিশ কর্ণডফ। **১৯০৮** সালের **১১ই** আগষ্ট তাঁর ফাঁসির দিন ধার্য হয়। সেদিন খুব ভোরে তিনি উঠে পড়েন কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিলো না কোনো ভয়, গ্লানি বা আফসোস। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তাঁর মনে যে যে সত্যের উপলব্ধি করিয়েছিল তাতে মৃত্যুকে আর তিনি ভয় পাননি। অবশেষে মুজফফরপুর সংশোধনাগারে মাত্র **১৮** বছর ৮ মাস ৮ দিন বয়সে তিনি দেশের জন্য নির্ভীক হৃদয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন।
১৯০৮ সালে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর স্মরণে পীতাম্বর দাস (মতান্তরে মুকুন্দ দাস) একটি বিখ্যাত গান রচনা করেন
"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি"
আমাদের সকলের উচিত এইসব বীরের জীবনী সম্পর্কে অধ্যয়ন করা, তাঁদের আত্মবলিদানকে সন্মান জানানো, তাঁদের জন্যই আজ আমরা স্বাধীনতার সুখ পাই।

তথ্যসূত্র:
১) ফাঁসির মঞ্চে ক্ষুদিরাম
২) সংসপ্তক ক্ষুদিরাম
৩) উইকিপিডিয়া
৪) বিভিন্ন আন্তর্জাল সূত্র



কুষ্ঠি, জ্যোতিষ গণনা কি সত্য?

ডা. শৈবাল বসাক

সেদিন আমার বড়দিদি তার প্রয়াত পতির কুষ্ঠি আমাকে দেখালেন। কলকাতাতে এক জ্যোতিষ করেছিলেন। সেখানে অনেক কিছুর সাথে বিবাহের সময় বয়স, পত্নীর সাথে সংসারকালের সময়সীমা এবং কত বছর বয়সে মৃত্যু, তা সব লেখা ছিল।

আমার জামাইবাবু কখনও তার এই কুষ্ঠি কাওকে দেখাননি, এমনকি আমার দিদিকেও। তার দোকানের সিন্দুকে সেটা রেখে দিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর দিদি তার দোকানের সিন্দুক পরিস্কার করতে গিয়ে কুষ্ঠিটা খুঁজে পায়। দিদি সেটা পড়ে দেখে যে, সবকিছু মিলে গিয়েছে।
জামাইবাবুর আয়ু লেখা ছিল ৭৫ বছর। কিন্তু সাড়ে ৭৪ বছর বয়স পর্যন্ত কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি যে, আগামী ছয়মাস পর তিনি মারা যাবেন। সুঠাম, কর্মঠ, নীরোগ ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি আমাকে বললেন যে, কিছুদিন যাবত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে তার হয়রান লাগে। আমি তাকে এক্সরে, ইসিজি করতে বললাম। সাথে সাথে তিনি তা করেননি। কিন্তু কিছুদিন পর যখন শ্বাসকষ্ট শুরু হলো, তখন হাসপাতালে একেবারে ভর্তিই হতে হলো। ফুসফুসের ক্যান্সার ধরা পড়লো, ফুসফুসে জলও জমে গিয়েছিল। ঠিক ঠিক ৭৫ বছর বয়স অতিক্রান্ত হবার পরেই তিনি মারা গেলেন।

আয়ু, সংসারজীবনের স্থায়িত্বকাল, অর্থনৈতিক স্থিতি ও পরিবর্তন, সন্তান সংখ্যা ইত্যাদি সব মিলে গিয়েছে কুষ্ঠির সাথে।



বাঙ্গালীর গর্ব শশাঙ্ক তথা বঙ্গেশ্বর শশাঙ্ক

উচ্ছ্বাস তালুকদার

শশাঙ্ক নামটিই যথেষ্ট গর্ব করার জন্য। ইতিহাসে প্রায় বিলুপ্ত সম্রাট শশাঙ্ক। উনি হচ্ছেন ইতিহাসের এমন এক নায়ক যিনি হঠাৎ করেই প্রকাশিত হয়েছিলেন। শশাঙ্কই প্রথম বাঙ্গালী হিন্দু সম্রাট যিনি প্রাচীন বঙ্গকে আলাদাভাবে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন। যদিও বেশিদিন স্বাধীনতা ধরে রাখতে পারেন নি তথাপি ইতিহাসপ্রেমীগণ শশাঙ্ককে সর্বদা ভক্তিভরে স্মরণ করবে।

বাঙ্গালী ইতিহাসবিদ ও ইতিহাস পাঠকদের নিয়ে এক শব্দে মন্তব্য করতে হলে বলতে হয় - অপ্রতুল। তাই তো সম্রাট শশাঙ্কের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে পাওয়াই যায় না। আমাদের সুপরিচিত দুইজন ঐতিহাসিকের দিকে নজর দেওয়া যাক - স্যার যদুনাথ সরকারের বইগুলোতে তথ্যগুলো বহিরাগত শাসকদের গ্রন্থ থেকে নেওয়া এমন স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের লক্ষণ সেন বিষয়ক তথ্যের ভিত্তি হচ্ছে পঞ্চাশ বছর পর দিল্লির কাজীর সংগৃহীত তথ্য। যদিও এক্ষেত্রে স্যার যদুনাথ সরকারের কিংবা নীহার রঞ্জন রায়ের কোনো দোষ দেখি না, দোষ যদি কারোর থাকে তবে পূর্বের বাঙ্গালী ঐতিহাসিক ও বাঙ্গালী পাঠকদের, কিছুটা অবশ্য সরকারেরও দোষ আছে। অনেক পূর্ব থেকেই বাঙালীদের ইতিহাসচর্চায় আগ্রহ কম তাও যৎসামান্য ঐতিহাসিক পাওয়া গেলেও সরকারি উদ্যোগে গবেষণা করার সুযোগ নেই বললেই চলে। বাঙ্গালী পাঠকদের দুরবস্থার কথা নাহয় না বলাই থাক। অতএব, আমার মন্তব্যটুকু যথার্থ কি না সেটা পাঠকগণ বিচার করবেন। (বিরোধীপক্ষের মত গ্রহণ করার অন্য একটি কারণও রয়েছে বটে সেটা সামনে পাবেন।)

সম্রাট শশাঙ্ক নিয়েও যতটুক তথ্য অধিকাংশ ইতিহাসবিদগণ ও বর্তমানের ইতিহাস পাঠকগণ প্রামাণিক মনে করেন সেটুকুও সম্রাটের পরম শত্রু বৌদ্ধ হর্ষবর্ধনের রাজকবি বাণভট্ট ও চৈনিক বৌদ্ধ পর্যটক হিউয়েন সাং (জুয়ানজাং নামেও পরিচিত) এর লেখাকে ভিত্তি করেই মনে করা হয়। ইতিহাসে শত্রুর প্রশংসা করেছে এমন ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল (কিছু যে করেনি এমন নয়)। পাঠকদের নিকট প্রশ্ন থাকবে - সাধারণভাবে বিচার করুন তো কেন কেউ নিজের শত্রুর প্রশংসা করবে? তার উপর সেই শত্রু যদি হয় শিব ভক্ত ও বৌদ্ধদের ত্রাস (যদিও কিছুটা রাজনৈতিক কারণে ও কিছুটা সনাতন বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শশাঙ্ক বৌদ্ধ বিরোধিতা

করেছেন বলে মনে করা হয়)
যাই হোক শশাঙ্ক নিয়ে গভীরে যাওয়ার পূর্বে জেনে নেওয়া যাক প্রাচীন বঙ্গের সীমা ও প্রাচীন বঙ্গের তখনকার অবস্থা সম্পর্কে।
গৌড়-দেশের সীমা-পরিমাণাদি সম্বন্ধে শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে (সপ্তম পটল) লিখিত আছে -

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তো শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥

অর্থাৎ- 'বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বরের সীমানা পর্যন্ত গৌড়দেশ নামে বিখ্যাত। এখানকার লোকেরা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। পাণিনির "অরিষ্ট-গৌড় পূর্ব্বে চ"শ্লোকে প্রতীত হয়, বঙ্গ ও গৌড় উভয়ের সাধারণ প্রাচীন নাম–গৌড় (এগুলো ইতিহাস বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থেই পাওয়া যায়)। গৌড় ও বঙ্গকে একারণে কিছু গ্রন্থে গৌড়বঙ্গ নামেও বলা হয়েছে। প্রাচীন গৌড় বা বঙ্গ যাই বলুন না কেন, এর গৌরব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সম্রাট শশাঙ্ক।

শশাঙ্কের পরিচয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন উনি গুপ্তদেরই বংশজ আবার কেউ বলেন উনি সম্পূর্ণ আলাদা কেউ। শশাঙ্কের বংশ নিয়ে প্রামাণিক দলিল পত্র পাওয়া যায় না। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে এটুকু বলা যায় শশাঙ্ক ছিলেন মহাসামন্ত এবং গুপ্তদের হয়েই বা গুপ্তদের সময় থেকেই মহাসামন্ত হয়ে একসময় কাজ করতেন। বিহারের সাহাবাদ জেলার শোন নদের তীরে রোটাসগড় দুর্গে পর্বত গাত্রে শীলমোহরের ছাঁচে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেব' - নাম পাওয়া যায় (লক্ষণীয় শশাঙ্কদেব)। যশোরের মুদ্রায় তাঁর উপাধি হিসেবে 'নরেন্দ্র গুপ্ত' ও 'নরেন্দ্রাদিত্য' খোদাই পাওয়া যায়। সে হিসেবে আমরা বলতে পারি যে তিনি গুপ্ত বংশের কিন্তু সরাসরি রাজপরিবারের নয়। শিশুতোষ সামন্তের মতে গুপ্তরা চন্দ্র বংশের ও তারা হচ্ছেন মাহিষ্য। তাছাড়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নামকরা ঐতিহাসিকগণও সম্রাট শশাঙ্ককে গুপ্তবংশের বলে অনুমান করেছেন। অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (কায়স্থ খণ্ড) নামক গ্রন্থে শশাঙ্ককে রাজা কর্ণদেবের বংশজ (মতান্তরে পুত্র) ও কর্ণসুবর্ণের প্রতিষ্ঠাতা দেব বংশীয় শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কায়স্থ বলা হয়েছে।



চিত্র: রোহতাসগড় দুর্গে পাওয়া শশাঙ্কের শীলমোহর

আমার মতে শেষোক্ত মতই ঠিক আছে অর্থাৎ শশাঙ্ক, 'দেব' বংশীয় কায়স্থই ছিলেন এবং একারণেই মহারাজ হওয়ার পূর্বে শীলমোহরে 'শশাঙ্কদেব' নাম পাওয়া গিয়েছে। নরেন্দ্রগুপ্ত বা নরেন্দ্রাদিত্য হচ্ছে গুপ্তদের থেকে প্রাপ্ত উপাধি। শিশুতোষ সামন্ত শশাঙ্ককে চন্দ্রবংশের বললেও এই অংশে 'উপাধি' শব্দটি উল্লেখ করেছেন যদিও নগেন্দ্রনাথ বসু নরেন্দ্রগুপ্তকে আলাদা বলে অনুমান করেছেন তথাপি আমার মতে উপাধি হিসেবে গণ্য। আমার এমন মত প্রদানের কারণ হচ্ছে, গুপ্তদের দুর্বল শাসন ব্যবস্থাকে উৎপাটিত করেই শশাঙ্কের উদ্ভব হয় তাছাড়া গুপ্তদের অধীনে মহাসামন্ত হিসেবে কাজ করেন। শিশুতোষ সামন্ত ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে গুপ্ত



চিত্র: রোহতাসগড় দুর্গ

শাসনামল শেষ হওয়ার পরেই শশাঙ্ক নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। যদি শশাঙ্ক, গুপ্ত বংশেরই হতেন তবে গুপ্ত শাসনামল শশাঙ্কের রাজা হওয়ার পূর্বে শেষ হওয়াটা অযৌক্তিক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর লেখা পড়লে বুঝা যায় পূর্বে সংগৃহীত প্রচলিত তথ্য ও বিরোধী পক্ষের তথ্যের দিকেই অধিক লক্ষ্য (যদিও বাণভট্ট ও হিউয়েন সাং এর বিরোধিতাও করেছেন) রেখে নিজ বক্তব্য লিখেছেন এবং একারণে শশাঙ্কের বংশ পরিচয় নিয়ে অনুমান করে শশাঙ্ককে গুপ্ত বংশের বলেছেন (রাখালদাস মহাশয়ের লেখায় স্পষ্টই রয়েছে যে অনুমান করা যায় যে শশাঙ্ক গুপ্ত বংশের)। কিন্তু শত্রুপক্ষের তথ্যকেই শুধু ভিত্তি মনে করলে তথ্য সবসময় সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা কম।

বাণভট্ট, হিউয়েন সাং নিজেদের গ্রন্থে শশাঙ্ককে অত্যাচারী হিসেবে তুলে ধরেছেন। বাণভট্ট কৃত হর্ষ চরিতে শশাঙ্ককে 'গৌড়ভুজঙ্গ' নামে সম্বোধন করা হয়েছে। হর্ষচরিতের বর্ণনায় সিংহনাদ নামক সেনাপতি হর্ষবর্দ্ধনকে বলছেন, "দেব, রাজ্যবর্দ্ধন দুষ্ট গৌড়ভুজঙ্গের দংশনে স্বর্গে গমন করিয়াছেন।" হিউয়েন সাং ও বাণভট্টের লেখায় পাওয়া যায় নিরস্ত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে ষড়যন্ত্র করে শশাঙ্ক ডেকে নিয়ে হত্যা করেন। ঠিক কোন স্থানে সম্রাট শশাঙ্কের সাথে রাজ্যবর্দ্ধনের যুদ্ধ হয়েছিল, বাণভট্ট সে বিষয়ে স্পষ্ট করে লিখে যান নি। "হর্ষচরিতের" ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে বর্ণিত হয়েছে, রাজ্যবর্দ্ধন স্থানীশ্বর হতে যুদ্ধযাত্রা করার পর, "বহুদিবস অতীত হলে", হর্ষ সংবাদ পান, "তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অক্লেশে মালবসৈন্যের পরাজয় সাধন করতে সমর্থ হলেও, শশাঙ্ক তাঁকে মিথ্যা লোভ দেখিয়ে, বিশ্বাস উৎপাদন করে, স্বভবনে (নিয়ে যান) অস্ত্রহীন অবস্থায় একাকী পেয়ে, গোপনে নিহত করেন।" হিউয়েন সাং এর গ্রন্থে এই বর্ণনার কিঞ্চিৎ বিকৃত প্রতিধ্বনি পরিলক্ষিত হয়েছে। হিউয়েন সাং লিখেছেন, প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর (হর্ষবর্দ্ধনের) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করে, সদ্ভাবে রাজ্যশাসন করছিলেন। এই সময় ভারতের পূর্ব্বাংশস্থিত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক অনেক সময় তাঁহার মন্ত্রিগণকে বলতেন,—'যদি সীমান্ত প্রদেশের রাজা ধার্ম্মিক হয়, তবে স্বরাজ্যের অকল্যাণ হয়।' এই কথা শুনে, তাঁরা রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করেন এবং তাঁকে নিহত করেন। কিন্তু এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ চন্দ, নগেন্দ্রনাথ বসু, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, শিশুতোষ সামন্ত সহ অনেক ঐতিহাসিকই বাণভট্ট ও হিউয়েন সাং এর স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করে ফেরার পথে শশাঙ্কের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন এবং যুদ্ধে পরাজিত, বন্দী ও নিহত হন। বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ নিজেদের লেখায় হিউয়েন সাং আদিকে পক্ষপাতদুষ্ট লেখা লিখেছেন বলেও উল্লেখ করেছেন। অতএব সম্রাট শশাঙ্কের ক্ষেত্রে রাখালদাসের মতো ঐতিহাসিকগণ শশাঙ্কের শত্রুপক্ষের বইপত্রকে ভিত্তি মনে করলেও সেসব বইকে সবক্ষেত্রে মান্যতা না দেওয়ায় সম্রাটের বংশ পরিচয় নিয়ে অনুমানের ভিত্তিও যে শুধু অনুমান মাত্র এবং উক্ত ঐতিহাসিকদের নিকট যথাযথ নয় সেটুকু আশা করি পাঠকগণ বুঝতে পেরেছেন। এবার প্রশ্ন আসতে পারে যে আমাদের বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ কেন বিরুদ্ধপক্ষের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন আবার বিরোধিতাও করেছেন? এটার উত্তর হচ্ছে - যতই বিরোধীতা করা হোক না কেন কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অযৌক্তিক বিষয় এসেই যায় এবং সত্য স্বীকারও কোথাও না কোথাও করেই আর সেগুলোই তুলে ধরেছেন আমাদের ঐতিহাসিকগণ। যেমন- রাজ্যবর্দ্ধন ও শশাঙ্ক শুরু থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী তাই শশাঙ্কের ভবনে যাওয়ার বর্ণনা অযৌক্তিক। বাণভট্ট শশাঙ্ককে গৌড়ধীপ বলে

সম্বোধন করে প্রশংসা করেছেন ইত্যাদি কারণেই ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি বিরোধী পক্ষ। শশাঙ্কের বংশ পরিচয় নিয়ে আমার যুক্তি তো প্রদর্শন করলাম বাকি সিদ্ধান্ত পাঠকগণ নিবেন।

শশাঙ্কের আবির্ভাব, প্রভাব ও অবদান: শশাঙ্ক যে ইতিহাসে হঠাৎ করেই আবির্ভূত হয়েছেন এ বিষয়েও পূর্বে বলেছি। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে – 'শশাঙ্কের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ যে তাঁহার এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌড়-রাজ্যের অভ্যুদয় নির্মেঘ-গগনে বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় একেবারে আকস্মিক বলিয়া প্রতিভাত হয়।' গুপ্ত সাম্রাজ্য ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে পতন ঘটলেও গুপ্ত রাজাদের প্রভাব তৎপরবর্তী সময়েও দেখা যায় (৫৬২ খ্রিস্টাব্দে মহাসেনগুপ্তের প্রভাব দেখা যায়), যদিও ৫৫০ খ্রিস্টাব্দের পরে আঞ্চলিক সামন্ত রাজারা গুপ্ত অধীনতা স্বীকার করতেন না। অতএব, ৫৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গুপ্তদের স্বর্ণযুগ ছিল বলা যায়। আঞ্চলিক শাসক তথা সামন্ত-মহাসামন্তদের স্বাধীনচেতা মনোভাবের মধ্যেই শশাঙ্ক উঠে আসেন এবং শশাঙ্কই সকল আঞ্চলিক শাসকদের মধ্যে নিজেকে যোগ্যতম হিসেবে প্রকাশ করেন। ৫৯০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই মহাসামন্ত শশাঙ্কের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে মহাসামন্ত থাকা অবস্থাতেই সৌর পঞ্জিকা অনুযায়ী বঙ্গাব্দ নামক নতুন বর্ষপঞ্জী



চিত্র: বামে - বৃষারূঢ় শিব (অনেকের মতে শশাঙ্ক)
ও ডানে - লক্ষ্মীমূর্তি

প্রচলন করেন। যদিও বঙ্গাব্দের প্রচলন নিয়ে ঐতিহাসিকদের অন্য দুই একটি মত প্রচলিত আছে কিন্তু যৌক্তিক বিচার, শশাঙ্ক কর্তৃক বঙ্গাব্দ প্রচলনের দিকেই ইঙ্গিত করে এবং অন্য মতগুলোতে যে ছেলেমানুষী হিসেব দেখানো হয়েছে সেটাও প্রমাণ করা যায় (অন্যদিন নাহয় এটা নিয়ে লিখব)। বাণভট্ট ও হিউয়েন সাং এর মতে শশাঙ্ক বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করতেন। পূর্বে উল্লেখিত ঐতিহাসিকগণ যুক্তি দেখিয়েছেন যে শশাঙ্ক শুধু রাজনৈতিক কারণেই বৌদ্ধদের বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের মনে বৌদ্ধ বিদ্বেষ ছিল না। তবে রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ তথা চিদ্ঘানন্দ পুরীর বই অনুযায়ী পাওয়া যায় পাশুপত আচার্য উদ্যোতকর তখন গৌড়ে ছিলেন। সম্ভবত উদ্যোতকরের প্রভাবেই শশাঙ্ক শৈবধর্মানুরাগী হন এবং পাশুপত শৈব মত গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের মতে ধর্মস্থাপনও ছিল শশাঙ্কের একটি উদ্দেশ্য এবং একারণেই শশাঙ্ক কৃত বোধিদ্রুম ছেদন, বুদ্ধমূর্তি অপসারণ ও মহেশ্বর মূর্তি স্থাপনের বিষয়ে পাওয়া যায়। ঐসময় মেদিনীপুর, কর্ণসুবর্ণ ও অন্যান্য স্থানেও বৌদ্ধ নিদর্শন উপস্থিত ছিল কিন্তু, সেসব স্থানে শশাঙ্কের আক্রমণের বিষয়ে কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। শশাঙ্ক রাজনৈতিক কারণে এবং সনাতন ধর্ম, বঙ্গ ও বঙ্গীয় ঐতিহ্যের জন্য ক্ষতিকর নাস্তিক বৌদ্ধদের বিরোধিতা করলেও সর্বোপরি বৌদ্ধ বিরোধী ছিলেন না। কারণ, বিষ্ণু অবতার ভগবান বুদ্ধ বেদ মান্য করতেন বিধায় বুদ্ধকে নাস্তিক বলা যায় না। তাছাড়াও মহারাজ শশাঙ্ক হাওড়ার আমতার সোমেশ্বর গ্রামে 'সোমেশ্বর শিব' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রভাসতীর্থের একটি শিলালিপিতে রয়েছে 'গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের দানক্ষেত্র'।

শশাঙ্ক সম্পর্কিত খুব বেশি তথ্য পাওয়া না গেলেও কর্ণসুবর্ণকে যে সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত করেছিলেন সেটার প্রমাণ সুস্পষ্ট। অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতির ভারত ইতিহাস নামক গ্রন্থে উল্লেখিত আছে - শশাঙ্ক কৃষিকাজের উন্নতির জন্য মেদিনীপুরে শশাঙ্কের দীঘি নামক জলসেচ ব্যবস্থা তৈরি করেন। ধনঞ্জয় দাস মজুমদারের লেখা অনুযায়ী বিদ্যাধরী নামে আরেকটি দীঘিও শশাঙ্ক উক্ত অঞ্চলে খনন করেছেন। ঐতিহাসিক গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে জানাচ্ছেন হুগলী জেলায় মাঝে মাঝে অবস্থিত কানসোনা খাল শশাঙ্কের স্মৃতি বহন করছে। ওড়িষ্যার বৈতরণী নদীর অনতিদূরে বেণুসাগর শশাঙ্কের নামের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা আরো জানিয়েছেন যে 'হর্ষের লেখমালায় শশাঙ্কের পরাজয়ের কোনো উল্লেখ নেই।' এত এত ষড়যন্ত্র করেও শশাঙ্ককে হারাতে না পারার দুঃখেই হয়তো শশাঙ্ককে নিয়ে তথ্যগুলো বিকৃত করা হয়েছে, শশাঙ্ককে ইতিহাসের খলনায়ক বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

শশাঙ্ক শুধু বঙ্গাব্দই প্রদান করেন নি, বাঙ্গালীত্ব ও এক অখণ্ড বাঙ্গালীজাতিসত্তা প্রদান করেছেন। আমাদের উচিত বঙ্গের গর্ব শশাঙ্ক সম্পর্কিত যতটুক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে বঙ্গ মাতার মান রক্ষা করা।

তথ্যসূত্র:

১) চন্দ্রবংশের ধারায় মহারাজ শশাঙ্কের অনুসন্ধান - শিশুতোষ সামন্ত
২) পৃথিবীর ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) - দুর্গাদাস লাহিড়ী
৩) বাংলার ইতিহাস - রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়
৪) গৌড়রাজমালা - রমাপ্রসাদ চন্দ
৫) শ্রীরাজমালা - কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত
৬) গৌড়ের ইতিহাস - রজনীকান্ত চক্রবর্তী
৭) বৃহৎ বঙ্গ - দীনেশচন্দ্র সেন
৮) বাণভট্ট কৃত হর্ষচরিতম - শ্রী প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
৯) বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব - নীহাররঞ্জন রায়
১০) আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ - রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
১১) বিভিন্ন আন্তর্জাল সূত্র

পুঁথিতে রামায়ণ

নিরঞ্জন চন্দ্র দাস

শুন শুন মনুষ্যগণ শুন দিয়া মন,
শ্রী রামচন্দ্রকে প্রণাম জানাইয়া শুরু করিলাম রামায়ণ চরিত্র বর্ণন।

ত্রেতাতে জয়-বিজয় আসিলো হয়ে রাবণ-কুম্ভকর্ণ,
তাদের সাথে আসিলো বংশ উদ্ধার হেতু তাদের অনুজ বিভীষণ।

ধর্ম রক্ষার্থে তিনি বিষ্ণু ভক্ত হয়ে আলোকিত করিলো এই ভুবন,
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধর্মের বিপক্ষে গিয়ে হলেন ঘরের শত্রু বিভীষণ।

রাবণের অত্যাচারে যখন কাঁদিতে থাকিল সাধু, সন্ন্যাসী আর যোগীগণ,
অযোধ্যায় তখন হইলো বিষ্ণুর সপ্তম অবতরণ।
নামকরণ হইলো তাহার রামচন্দ্র, সাথে আসিলো শেষনাগ লক্ষ্মণ।
আরো আসিলেন দুই ভ্রাতা ভরত, শত্রুঘ্ন,
তাহারা চার দেহধারী হলেও ছিলেন বিষ্ণুরই চার অঙ্গ।



মিথিলাতে আসিলো ভূমি কন্যা ভূমিসূতা,
জন্মের পর তাহার নাম হইলো মাতা সীতা।

মিথিলাতে হইলো মিলন রাম-সীতার জয় করে হরধণ,
ক্রুধিত হইয়া পরশুরাম রামকে দেয় শর্ত জ্যা পরাইয়া দেখাতে হবে সারঙ্গ ধনু।

জ্যা পরাইয়া প্রমাণ করে বিষ্ণুরই অবতার রাম,
পরশুরামের অহংকার চূর্ণ করিয়া রামচন্দ্র করে তাহাকে প্রণাম।

মিথিলাতে লীলা শেষ করে অযোধ্যায় করে গমন,
এবার বলিব তার পরের কাহিনী সবাই শোন দিয়া মন।



পিতৃ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় শ্রীরাম বনবাসের পথে করে গমন,
শ্রীরামের সঙ্গী হলেন মাতা সীতা আর শ্রীমান লক্ষ্মণ।

পথিমধ্যে মাতা শবরীর পূরণ করেন মনোস্কামনা,
রামের দর্শনের জন্য অনেক বছর করেন তিনি সাধনা।

একদা একদিন রাক্ষসী শূর্পনখা করেন শ্রীরামের দর্শন,
রামের রুপ দেখিয়া তাহার প্রেমে মোহিত হোন।

কামের বশে ফেলার জন্য রামের সাথে করেন ছলনা,
তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ তীর দিয়ে নাসিকা দেন কাটিয়া।

শূর্পনখা পলায়ন করে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলিয়া,
ভ্রাতা রাবনের কাছে যান নালিশ নিয়া।

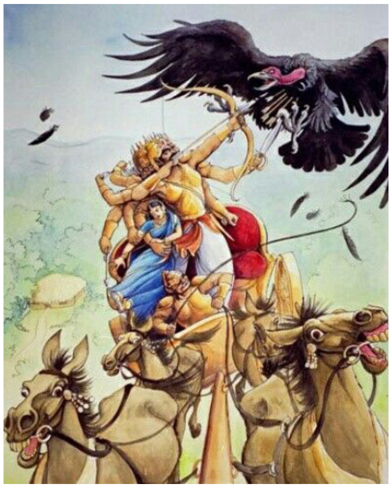
বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে ছুটে সেই বনে,
সেখানে মাতা সীতাকে দেখিয়া মোহিত হোন সীতার আবরণে।

মায়া রচনা করে কুটির থেকে দূরে নিয়ে যান রাম লক্ষ্মণকে ,
এদিকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে হরণ করেন মাতা সীতাকে।

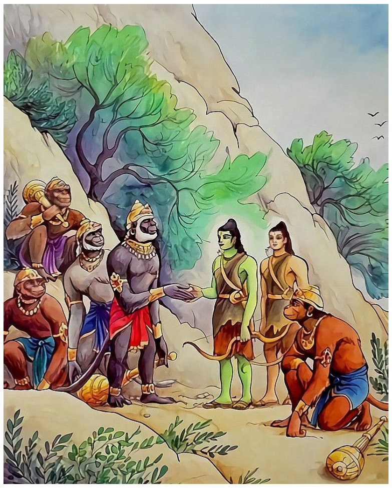
কুটিরে আসিয়া দেখেন সেখানে নেই মাতা সীতা,
হন্য হয়ে খুঁজতে থাকেন রাম, লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা।

সীতাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত জটায়ু দেন মাতা সীতার সন্ধান,
তাহাকে অপহরণ করিয়াছে লঙ্কাপতি দশানন।

জটায়ুর অন্তোষ্টিক্রিয়া করিয়া পাড়ি দেন লঙ্কার সন্ধানে,
অনেকটা পথ পাড়ি দেওয়ার পর রামায়ণ স্বার্থক হয় রাম-হনুমানের মিলনে।







হনুমান বানর সেনা সহায়ক হয় রামের সঙ্গে,
হনুমান রাম নাম লেপন করে তাহার সারা অঙ্গে।

লঙ্কা যাওয়ার পথে বাঁধা হয় বিশাল এক সাগর,
সাগর পাড়ি দেয় রাম নামের ভাসাইয়া পাথর।

রামের সাথে আরো সঙ্গী হয় বিষ্ণুভক্ত, রাবণের কনিষ্ঠ বিভীষণ,
তারই প্রচেষ্টায় বধ হোন অজেয় মেঘনাদ, কুম্ভকর্ণ ও লঙ্কাপতি রাবণ।

লঙ্কার নতুন রাজা ঘোষিত হোন বিভীষণ,
তাহার সাথে শেষ হইলো আমার সংক্ষিপ্ত পুঁথি আকারের রামায়ণ।

আমারও এই পুঁথি শেষ করিলাম রামের চরণে করিয়া প্রণাম,
আপদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে সবাই কহিবে জয় শ্রীরাম।



সংস্কৃত সহজপাঠ – দৈনিক প্রয়োগে উপযোগী শব্দ ও বাক্য

সংস্কৃত শব্দ

प्रपञ्च (প্রপঞ্চ) — জগতের মায়া
प्रगल्भ (প্রগল্ভ) — সাহসী
निरञ्जन (নিরঞ্জন) — নির্মল
अलक्षित (অলক্ষিত) — অদৃশ্য
औदार्य (ঔদার্য) — উদারতা
ऋद्धि (ঋদ্ধি) — সমৃদ্ধি
श्लेष (শ্লেষ) — দ্ব্যর্থকতা
लिप्सा (লিপ্সা) — লোভ
ईक्षण (ঈক্ষণ) — দৃষ্টি
अनिर्वचनीय (অনির্বচনীয়) — বর্ণনাতীত

সংস্কৃত বাক্য

विनयः शोभा मनुष्यस्य
বিনয়ঃ শোভা মনুষ্যস্য
বিনয় মানুষের শোভা

अति सर्वत्र वर्जयेत्
অতি সর্বত্র বর্জয়েত্
অতিরিক্ত সবই ক্ষতিকর

न हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः प्रविशन्ति
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য মুখে মৃগাঃ প্রবিশন্তি
ঘুমন্ত সিংহের মুখে হরিণ নিজে থেকে প্রবেশ করে না (ঘুমিয়ে সফলতা আসে না)

SCAN NOW

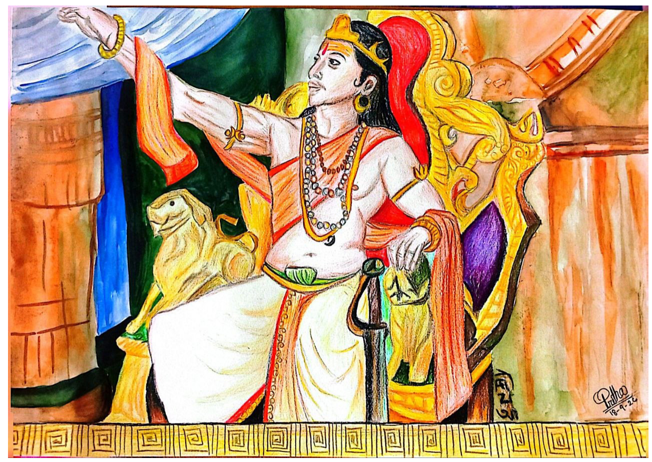
কোর্স করতে QR কোড স্ক্যান করুন বা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন...



চিত্রাঙ্কন কলাম



অঙ্কনে: স্নেহা গাইন



অঙ্কনে: পৃথা সান্যাল





প্রশ্নোত্তর পর্ব: আপনাদের প্রশ্ন, আমাদের উত্তর

প্রশ্ন - ১: বেদ মন্ত্রের দেবতা দ্বারা কি দানশীল মানুষ বুঝানো হয়?

উত্তর: না, নিরুক্ত ৭/১ অনুযায়ী - 'ঋষি, অভীষ্টার্থ জানিয়া যে দেবতাকে স্তুতি করেন, তিনিই ঐ স্তুতিমন্ত্রের দেবতা।
মূলত, নিরুক্ত ৭/১৫ এ উল্লেখিত 'দেবো দানাদ্বা...' অর্থাৎ দানের লক্ষণ যার সেই দেবতা, থেকেই আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ বলেন - যে মানুষ দান করেন সেই দেবতা। কিন্তু, উক্ত অংশে অন্যান্য যে সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন - দ্যুলোকে (পৃথিবী থেকে আলাদা) অবস্থানকারী, জ্যোতিময় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য মানুষের সঙ্গে মেলে না। পুরাণ অনুসারে, দেবতা হচ্ছে পদ তবে বৈদিক মন্ত্রে প্রয়োগ অনুসারে কোথাও দেবতা দ্বারা ঈশ্বরকে বুঝানো হয় ত কোথাও দেবতা আলাদা সত্তা, এই আলাদা সত্তাই মূলত পুরাণ অনুযায়ী পদ। যেমন - কল্পান্তরে ব্রহ্মার আয়ু শেষ হয় তথা পদে স্থায়িত্বকাল শেষ হয়। তাছাড়া, নিরুক্ত ১/২০ (বাংলা ভার্সনে ১ম অধ্যায়, ৩য় পাদ, ৯ম পরিচ্ছেদ) এ পাওয়া যায় - 'দেবমনুষ্যস্থানেষু' অর্থাৎ, দেবলোক ও মনুষ্যলোক; অতএব, দেবতা ও মনুষ্য যে আলাদা এটা নিরুক্তও বলছে। এটা ছাড়াও বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ তথা শুক্ল যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ - ১/৪/১৫ এর শঙ্করভাষ্যে বর্ণ বিচার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েও দেব ও মনুষ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। একই উপনিষদের ১/৪/১১ থেকে ১/৪/১৩ পর্যন্ত দেবতাদের মধ্যে বর্ণ বিভাগ নিয়ে আলোচনা আছে।
অতএব, এটাই স্পষ্ট হলো যে - দেবতা মানে, দানশীল মানুষ নয় বরং মানুষ চাইলে দেবতা পদ লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন - ২: উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন মূলত কি? এগুলোর সময়কালের শুরু ও শেষ কখন হয়?

উত্তর: স্মৃতিশাস্ত্রে আছে,

দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্ দক্ষিণায়নম্।।

(মনুস্মৃতি - ১/৬৭)

অনুবাদ: মানুষদের এক বৎসর (১২ মাস) দেবগণের এক দিনরাত্রি হয়। তার (অর্থাৎ দেবগণের দিন ও রাত্রির) আবার উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন-এই দুটি বিভাগ। এদের মধ্যে উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন এবং দক্ষিণায়ন তাঁদের রাত্রি।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের হিসেবে, সূর্য যখন দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উত্তর গোলার্ধের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, সেই সময়কালকে উত্তরায়ণ বলে। অন্যদিকে, সূর্য যখন উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে যাত্রা শুরু করে, তখন তাকে দক্ষিণায়ন বলে। মাঘ মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে উত্তরায়ণ এবং পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির দিন থেকে এর শুরু হয়। শ্রাবণ মাস থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে দক্ষিণায়ন এবং কর্কট সংক্রান্তি থেকে এর শুরু হয়।

প্রশ্ন - ৩: রামচন্দ্র কি ঈশ্বর বা ঈশ্বর অবতার নন? আজকাল রামচন্দ্রকে মহাপুরুষ, যোগী, অনুসরণীয় মানুষ ইত্যাদি হিসেবে মানা হয় - এগুলো কি যথার্থ?

উত্তর: ধর্মীয় দৃষ্টিতে রামচন্দ্রকে মানুষ মনে করা অজ্ঞতার প্রতিফলন মাত্র। যারা মূল বাল্মীকি রামায়ণ অন্তত পড়েছেন তারাও একথা বলবেন না। বাল্মীকি রামায়ণে আছে -

সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।

(বাল্মীকি রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১১৭/২৭-২৮, খণ্ডাংশ)

অর্থাৎ, সীতাদেবী লক্ষ্মী এবং আপনিই প্রজাপালক কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণু। আপনারা রাবণ-বধের নিমিত্তই মনুষ্য দেহ ধারণ করেছেন।

এছাড়াও, শ্রুতিতে রামকে পরমেশ্বর সম্বোধন করে মূর্তি বর্ণিত হয়েছে -

মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং যাম্যে বামে তেজঃপ্রকাশনম্।
ধৃত্বা ব্যাখ্যাননিরতশ্চিন্ময়ঃ পরমেশ্বরঃ।।

(অথর্ববেদ, রামতাপনীয় উপনিষদ, পূর্বভাগ, ৬/১)

অর্থাৎ, চিন্ময় পরমেশ্বর শ্রী রাম দক্ষিণ হস্তে জ্ঞানমুদ্রা এবং বাম হস্তে ধনুর্মুদ্রা ধারণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন।

আপনার প্রশ্ন পাঠাতে অনুসরণ করুন অথবা **স্ক্যান করুন**

To: shashwata.satya@gmail.com

Subject: প্রশ্নোত্তর পর্ব

Compose email
প্রশ্ন - ....?
নাম - (বাংলায় আপনার নাম লিখবেন)
ঠিকানা - (উপজেলা, জেলা ও বিভাগের নাম লিখবেন)

Scan



মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শরণং প্রপদ্যে।।
জ্ঞানচর্চা প্রকাশনী